নিদর্শন স্বরূপ তাহার রণবাদ্য থামাইয়াছে। অমূল্য রত্নরাজি ভূষিত দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া রাক্ষস-প্রধান নতজানু হইয়া বসিয়াছে। তাহার গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে। কহিল,—"মহান্ মোমো-টারো! আমায় প্রাণ দান করিতে আজ্ঞা হোক্। আজ্ হইতে আমার জীবনের পরিবর্ত্তন হইল। আমি আর অসৎ কর্ম্ম করিব না।"

মোমোটারো ঘৃণার সহিত হাসিয়া কহিলেন,—"কাপুরুষ! শুধু আপন প্রাণের কথা ভাবিতেছিস্! অনেক দিন হইতে অসংখ্য অসহায় নিরীহ লোককে যাতনা দিয়াছিস্, এবার দয়াভিক্ষা পাইবি না। তোকে বন্দীস্বরূপ জাপানে লইয়া যাইব, সেখানে তোর কর্ত্তিত মুণ্ড তোরণ দ্বারের উপর স্থাপন করিয়া লোক-শিক্ষা দেওয়া হইবে।

আজ্ঞামাত্র বানর রাক্ষসকে রজ্জুবন্ধনে বাঁধিল। রাক্ষসদের সঞ্চিত অতুল ধনরত্ন ও সংগৃহীত হইল। অসংখ্য মণিমুক্তা প্রবাল এবং বিচিত্র ঐন্দ্রজালিক জামা ও ছাতি, যাহা সঙ্গে থাকিলে লোকনয়নের অগোচরে থাকা যায়, তাহাও পরিত্যক্ত হইল না।

সাগরতরী এ সকলই আপনবক্ষে বহিয়া জাপানে আনিল। সৌভাগ্য, ওজিছান ও ওবাছান বিজয়ী মোমোটারোকে ফিরিয়া পাইয়া পুনরায় পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।*

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

বিল্ব-মঙ্গল।

নবজীবন লাভ।

বিল্বমঙ্গল এক্ষণে অন্ধ। অন্ধজীবন যে কত কষ্টপূর্ণ এবং ভারবহ, তাহা অন্ধ ভিন্ন আর কেহ ভাল বুঝিতে পারিবে না। বিল্বমঙ্গল এইরূপ ভারবহ জীবন লইয়া গৃহস্থের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যে প্রণয় চিন্তামণিকে দিয়াছিলেন, যে প্রণয় দ্বারা পরিচালিত হইয়া গৃহস্থ রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, আজ বিল্বমঙ্গল তদপেক্ষা অধিক প্রেম হরিপদে ঢালিয়া দিলেন। কি জানি সেই প্রেমের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় তীর্থভূমি বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিল্বমঙ্গলের বাহিরের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে; তিনি আর বাহিরের দৃশ্য, বাহিরের ছবি কিছুই দেখিতে পান না। সদ্‌গতির জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে অন্তর্দৃষ্টি ফুটিল—তখন সচ্চিদানন্দ হরির অপরূপ রূপ দেখিয়া বিহ্বল হইলেন।

অন্ধজীবন বিড়ম্বনাপূর্ণ। ইচ্ছায় হউক

---

* Translated From "Fairy Tales from far Japan" by Susan Ballard of the St Hilda Mission, Tokyo.

বা অনিচ্ছায় হউক, বিল্বমঙ্গল যখন সেই দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার সেই সকল বিড়ম্বনা অতিক্রম করাও অবশ্য অসম্ভব। এই জন্য বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবনে যাইবার সময়ে পথে অনেক কষ্ট পাইলেন। কতবার হোঁচোট খাইয়া পড়িয়া গেলেন, কতবার শরীরে আঘাত লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত এবং পদদ্বয় কণ্টকবিদ্ধ হইল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এইরূপে দারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবন অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি মনে করিলেন, এ সব তাঁহার জীবনে অর্জ্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তিনি অনেক পাপ করিয়াছেন, এ সব তাহার ফলভোগ মাত্র। এইরূপে আপনার মনকে আশ্বস্ত করিয়া দুঃখিত ও অনুতপ্ত অন্তঃকরণে বিল্বমঙ্গল অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে সহসা একটা কণ্টকপূর্ণ গর্ত্তমধ্যে পতিত হইলেন। সর্ব্বাঙ্গে কণ্টকবিদ্ধ হইয়া শোণিতের স্রোত বহিতে লাগিল। বিল্বমঙ্গল যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বিঘ্নবিনাশন হরিকে কাতর ভাবে ডাকিতে লাগিলেন।

ভক্তেরা ভগবানকে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু বলিয়া থাকেন। তাঁহার নামের এমনি গুণ যে, "অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেঁটে যায়, বোবায় গীত গায়, বধির শোনে। তাঁহার নামের বর্ণে বর্ণে সুধামৃত ক্ষরে, শুষ্ক তরু মঞ্জরে, জলে পাষাণ ভাসে। তাঁহার নামে অঙ্গ শীতল হয়, মরা মানুষ বেঁচে যায়, পাপ তাপ সব দূরে পলায়ন করে।" এই সকল বিষয় ধর্ম্মজগতের পরীক্ষিত সত্য—কল্পনার কথা নয়। বিল্বমঙ্গল কণ্টকপূর্ণ গর্ত্তমধ্যে পতিত হইয়া দয়াময় হরিকে ডাকিতেছেন, এমন সময়ে একজন আগন্তুক * আসিয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহাকে তুলিলেন। বিল্বমঙ্গল গর্ত্ত হইতে মুক্ত হইয়া পতিতপাবন পরমেশ্বরকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। মনুষ্য যতই পাপ করুক, যতই অধঃপতিত হউক না কেন, পরমেশ্বরের কৃপা হইতে কদাপি বঞ্চিত হয় না। এইজন্য বিল্বমঙ্গল বারম্বার ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন এবং তাঁহার পবিত্র ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও জগদীশ্বরের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলেন না। আমরা খাই দাই, মনের সুখে ভ্রমণ করি, এইজন্য ভগবানের দয়া অনুভব করিবার অবসর পাই না, সে চেষ্টাও করি না। কিন্তু একবার বিপদে পড়িলে কিম্বা অসহায় অবস্থায় পতিত হইলে নিশ্চয় আমাদিগের চৈতন্য হইবে; নিশ্চয় আমাদিগকে আমাদিগের পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া প্রভু পরমেশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে। বিল্বমঙ্গল নিতান্ত পাপী ছিলেন সত্য, কিন্তু এই প্রকারে প্রখর অগ্নিতে বারম্বার দগ্ধীভূত হইয়া নবজীবন লাভের জন্য উপযুক্ত হইলেন।

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কোথায় যাইবে?" বিল্বমঙ্গল বলিলেন "আমার ইচ্ছা বৃন্দাবনে যাইব; কিন্তু আমি

* কথিত আছে, ইনিই ছদ্মবেশী ভক্তবৎসল শ্রীহরি।

অনেক পাপ করিয়াছি, আমার ভাগ্যে বোধ হয় আর বৃন্দাবন দর্শন ঘটিল না।” আগন্তুক বলিলেন “তুমি নিরাশ হইও না। আমি বৃন্দাবনে যাইতেছি, তুমি আমার সহিত চল।” বিল্বমঙ্গল আগন্তুকের হাত ধরিয়া মহানন্দে বৃন্দাবনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে আগন্তুক প্রাণপণ যত্ন করিয়া বিল্বমঙ্গলের সেবা করিলেন। বিল্বমঙ্গল তাঁহার এই অযাচিত অপার অনুগ্রহ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন।

বিল্বমঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন “বৃন্দাবন আর কত দূর?” আগন্তুক বলিলেন আর বেশী দূর নয়, এই আসিয়া পৌঁছিলাম।” বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবন দর্শনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অনেক কষ্ট ও বিপদের পর আজ সেই আশা চরিতার্থ হইল দেখিয়া বারম্বার কৃতজ্ঞ চিত্তে অশ্রুপাত করিলেন এবং দয়াল হরিকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তাঁহার মুমূর্ষু প্রাণে যেন সহসা নবজীবনের সঞ্চার হইল। এই সময়ে তাঁহার বিশ্বাস আরও গাঢ়তর—গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। তিনি হরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া সেই হরিসত্তা মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার ভেদাভেদ জ্ঞান আর রহিল না, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কেবল হরিময় প্রতীয়মান হইল।

যুগল মিলন।

আগন্তুক বিল্বমঙ্গলকে বৃন্দাবনে পৌছাইয়া দিয়াই চলিয়া গেলেন। বিল্বমঙ্গল মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন “আমি মহাপাপী, আমায় যিনি স্পর্শ করিলেন, আমায় যিনি কণ্টক হইতে উদ্ধার করিলেন এবং পথে নানা প্রকার সেবা শুশ্রূষা করিয়া বৃন্দাবন পর্য্যন্ত আমার হাত ধরিয়া লইয়া আসিলেন, তিনি কদাপি সামান্য মনুষ্য নন; তিনি নিশ্চয় স্বয়ং ঈশ্বর হইবেন।” ইহা ভাবিয়া—“কোথায় আমার প্রাণের হরি, কোথায় আমার প্রাণের কৃষ্ণ” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু বাহিরে কাহারও নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া বিল্বমঙ্গল প্রাণের আবেগে বলিয়া উঠিলেন,

“হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোসি
বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতং।
হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি
পৌরুষং গণয়ামি তে॥”

অর্থাৎ “হে কৃষ্ণ! তুমি বলপূর্ব্বক আমার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? যদি তুমি আমার হৃদয় হইতে বাহিরে যাইতে পার, তবে আমি তোমার পৌরুষ গণনা করি।”

বিল্বমঙ্গলের নবজীবন এইখানে পূর্ণতা লাভ করিল। সেই দিন হইতে শান্তি লাভ করিয়া বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবনে বাস পূর্ব্বক ধর্ম্মসাধন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম তাঁহার প্রাণ এবং ঈশ্বর তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল। তিনি বৃন্দাবনে থাকিয়া “কৃষ্ণকর্ণামৃত” নামক ভক্তি-প্রধান বৈষ্ণবগ্রন্থ রচনা করিলেন। এই

গ্রহ ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্ত দেবের অত্যান্ত প্রিয় ও আদরের বস্তু হইয়াছিল।

বিল্বমঙ্গল সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে চিন্তামণির ঘৃণিত বেশ্যাবৃত্তির জন্য আপনার প্রতি অতিশয় ধিক্কার জন্মিল। তিনি আত্মপাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। হৃদয়ে হরি-ভাবনা, মুখে হরিনাম, নয়নে প্রেমজল প্রকাশিত হইয়া চিন্তামণির জীবনকে দিন দিন পরিশুদ্ধ করিতে লাগিল।

চিন্তামণি এইরূপে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে দৈববলে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে বিল্বমঙ্গলের সহিত তাঁহার পুনর্মিলন হইল। কিন্তু এ মিলন পুরাতন মিলন নয় —ভক্তের সহিত ভক্তের পবিত্র মিলন। বৃন্দাবনে যুগল মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল—যুগল মিলন সম্পাদিত হইল। এই যুগল মূর্ত্তির প্রেমে, ভক্তিতে, এবং সাধনের বলে বৃন্দাবন ক্ষেত্র গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল। এই আনন্দময় দৃশ্য দর্শন করিয়া অনেক পাপী নবজীবন লাভ করিল। এইরূপে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া, অপবিত্র জীবনকে পবিত্র করিয়া, চিন্তামণি বিল্বমঙ্গল অমরধামে যাত্রা করিলেন। ধন্য বিল্বমঙ্গল! তুমি নিজে অমর হইলে এবং আমার মত কত শত পাতকীর অমরত্ব লাভ করিবার পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়া গেলে। তোমার পরিত্রাণের মঙ্গলময় সুসমাচার্‌ পাপী তাপীর ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া কীর্ত্তিত হউক এবং তাহাদিগের জীবনগতি পরিবর্ত্তিত করিয়া নবজীবন সঞ্চারের সহায়তা করুক।

অ, যো।

শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা।

(৪২৮-২৯ সংখ্যা ১৮৬ পৃষ্ঠার পর)।

এইরূপ উৎসবের ইয়ত্তা করা বড় সুকঠিন। এই সব উৎসব উপলক্ষে হাজার হাজার দেশী ও বিদেশী লোকের এক স্থানে সমাবেশ সাতিশয় আমোদ-জনক। জগন্নাথের মন্দিরে কাহারো লজ্জা নাই। মান সম্মানের দিকে কাহারো দৃক্‌পাত নাই। সকল লোকেই সেই দেবদুর্লভ পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্যই ব্যস্ত। মন্দিরের ভিতরে সকলেই যেন প্রভুর প্রেমে মাতোয়ারা। এখানে আসিলে ঘোর পাপীরও মনে অনুতাপানল প্রজ্জলিত হয়—ঘোর সন্তাপীও শান্তি লাভ করে।

এখন এই সব উৎসবে কি কি ক্রিয়া-কলাপ হয়, তাহা কিঞ্চিৎ বলিব। জগন্নাথের জন্মাষ্টমীতে একজন উড়িয়া

(জগন্নাথের পিতা) বসুদেব ও একজন (জগন্নাথের মাতা) দেবকী সাজে সজ্জিত হয়। শাস্ত্রমতে মদনমোহনকে ভূমিষ্ঠ করান হয়। অনন্তর নাড়ীচ্ছেদ ও গলা তোলা ইত্যাদি কর্ম্মের সময় চারিদিক্ হইতে রমণী-রসনা-মুক্ত হুলুধ্বনি এবং পুরুষকণ্ঠ-বিনিঃসৃত গভীর জয় জয় নাদ উত্থিত হয় এবং সমস্ত পুরী যেন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হয়। এই সময় সমবেত মানবমণ্ডলীর ঘন ঘন প্রণিপাত, অনুচ্চস্বরে মঙ্গল প্রার্থনা ও অকৃত্রিম প্রেমভরে অশ্রুপাত অবলোকন করিলে প্রাণের ভিতর এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। জগন্নাথের পুরীর বাহিরে দোল-বেদী আছে। ইহা একটি সমুচ্চ প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ। দোলপর্ব্ব উপলক্ষে লক্ষ্মী সত্যভামা রামকৃষ্ণ সহদেব মদনমোহন জগন্নাথের পুরী হইতে নিক্রান্ত হইয়া দোলবেদীকে সপ্ত বার প্রদক্ষিণ করেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শত শত লোক পরমানন্দে গমনাগমন করিতে থাকে। এই কার্য্য মধ্যাহ্ন সময় সমাধা হয়। মাথার উপর ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্র, পদতলে রৌদ্রতাপিত অতি তপ্ত বালুকারাশি। ক্ষুৎ পিপাসায় তখন কাহারো চিত্ত স্থির থাকিবার কথা নয়। তথাপি একটি লোকও বেদীতে মদনমোহন দর্শনের আশা পরিত্যাগ করে না। ঘন ঘন শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশীর উচ্চ শব্দে কর্ণ বধির হয়। সেই সময় আবার দলে দলে মধুর হরিসঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়া চারিদিকে অমৃত বর্ষণ করে।

দোলযাত্রায় স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর হরিসংকীর্ত্তন এবং তৎসঙ্গে যে মধুর নৃত্য দেখিয়াছি, তাহা আর এ জীবনে কখনও ভুলিব না। ফল্গুতে সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত, মস্তক অবনত, বিশাল বাহুদ্বয় শিষ্যদ্বয়ের স্কন্ধে সংলগ্ন, মুখে ঘন ঘন হরিনাম। দিবা দ্বিপ্রহরে প্রখর রবিতাপে বলিষ্ঠ যুবকগণ ক্লান্ত হইতেছে, কিন্তু সেই ষাটি বৎসরের বৃদ্ধ অদম্য উৎসাহে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহাতে ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই। সেই পুরুষসিংহ প্রবীণ বিজয়কৃষ্ণকে যে একবার দেখিতেছে, সেই ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছে। হায়! সে মহাপুরুষ আর এই সংসারে নাই। তিনি অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ সেই ভক্তের পবিত্রাত্মাকে সাদরে গ্রহণ করুন্।

লক্ষ্মীসহ মদনমোহন ও রামকৃষ্ণ দোল বেদীর উপর উঠিয়া পুনরায় আননকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন। সেই সময় চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গে নানারূপ পুষ্প বৃষ্টি হইতে থাকে। অনন্তর তাঁহারা দোলবেদীতে উপবিষ্ট হন। তখন শত সহস্র মস্তক তাঁহাদের চরণাম্বুজে বিলুণ্ঠিত হয়।

দর্শক বৃন্দের নিক্ষিপ্ত ফল্গু এবং পুষ্পে বিভূষিত হইয়া ঠাকুর তখন যেন সাক্ষাৎ আনন্দময় রূপই প্রকাশ করেন। এই ভাবে সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইলে বিশদ-বসনা জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর আগমন হয়। সেই জ্যোৎস্না-প্রোৎসাহিত নির্ম্মল

জগৎকে প্রেমালিঙ্গন দান করিবার জন্যই যেন তাঁহারা চন্দ্রাভরণ-ভূষিত প্রদীপ্ত চন্দ্রাতপতলে সমস্ত রজনী দণ্ডায়মান থাকেন।

সেইখানে যথারীতি দোলক্রীড়া সম্পন্ন হইলে মদনমোহন সেই রজনীতেই পুনরায় পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। জগন্নাথের মন্দিরের নিকট একটি মন্দির আছে, তাহার নাম "মুক্তিমণ্ডপ।" এই মুক্তিমণ্ডপে দলে দলে কুলীন ব্রাহ্মণেরা বসিয়া থাকে এবং বলে ছলে কৌশলে যাত্রীদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। মুক্তিমণ্ডপের নিম্নে অবতরণ করিয়া পয়সা চাহিলে তাহাদের নাকি অপমান হয়!

কথিত আছে মুক্তিমণ্ডপের ব্রাহ্মণদিগকে অর্থ দিলে যাত্রীরা সত্য সত্যই মুক্তিলাভ করে। কিন্তু হায়! সেই অলস যণ্ডদের বলিষ্ঠ মূর্ত্তি এবং অর্থ সংগ্রহ করিবার পৈচাশিক ধরণ দেখিলে তাহাদিগকে একটি কানাকড়িও দিতে ইচ্ছা করে না। তবে না দিয়াও যাত্রীরা মুক্তি লাভ করিতে পারে না!

এই মুক্তিমণ্ডপে ঝুলন হয়। লক্ষ্মীসহ মদনমোহন আবাস পরিত্যাগ করিয়া এই মুক্তিমণ্ডপে বিরাজ করেন। তৎকালে ঝুলনের যে কি অপূর্ব্ব বাহার হয়, তাহা এই ক্ষুদ্র লেখনীতে প্রকাশ করা নিতান্তই অসাধ্য। কৃত্রিম কুঞ্জবনের মধ্যে ফুলের ঘর। সেই ফুলের ঘরের মধ্যে আর এক ফুলের ঘর, ফুলের উপর ফুল, তাহার উপর ফুল, তাহার উপর ফুল!! যূথী, জাতি, মধুমালতী, চাঁপা, নাগেশ্বর ইত্যাদি ফুলের অন্ত নাই। চারিদিকে ফুল, তাহার মধ্যে লক্ষ্মী মদনমোহনের যুগলরূপ। তাহা আবার নানাবিধ ফুলের সাজে সাজানো। যেন

'ফুল চোক ফুল মুখ ফুল তনুখান,
ফুলের ছাওয়াল সে যে ফুলে শোভমান!'

সে ফুল আবার যে সে ফুল নয়, সব ফুলই সুগন্ধ। সেই ফুলের উপর আবার অগুরু চন্দনের ছড়া। পশ্চাৎ হইতে একজন সেই পুষ্পপুঞ্জ স্থানে ঝুলনটিকে মৃদু মৃদু দুলাইতেছে। ঝুলনটি মৃদু মন্দ দুলিতেছে। পুষ্পগুলি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া গা নাড়া দিতেছে। সম্মুখে ঘৃতের বাতি, সেই উজ্জ্বল দীপালোকে ঠাকুরের পুষ্পখচিত সুন্দর মুখ জল জল করিতেছে, ঝল মল করিতেছে, চক্ চক্ করিতেছে। আহা কি মধুর দৃশ্য!

মুক্তিমণ্ডপের নিম্নে নাতিদীর্ঘ নাতিপ্রশস্ত প্রস্তর-মণ্ডিত এক খণ্ড সমতলভূমি আছে। সেই সমতল ভূমিতে মদনমোহনের সম্মুখে একটি সাত আট বৎসরের উড়িয়া বালিকা নৃত্য করে। সেই নৃত্যের ভঙ্গিমাই বা কি সুন্দর! বালিকা নৃত্যচ্ছলে যেন হস্ত প্রসারিত করিয়া ঠাকুরকে ডাকিতেছে। কখনো বা রোষভরে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে। কখনো পরম আদরে—পরম ভক্তিসহকারে ঠাকুরকে কোলে লইতে চাহিতেছে। কখনো বা স্নেহভরে ননী

খাওয়াইতে যাইতেছে। কখনো বা নৃত্যময়ী বালিকা বালস্বভাব বশতই যেন নৃত্যচ্ছলে ঠাকুরের ক্রোড়ারোহণ করিতে চাহিতেছে।

এইরূপ তিন দিন এবং তিন রজনী অতিবাহিত হইলে পরে সুখের ঝুলন যাত্রা শেষ হয়। জগন্নাথের চন্দনযাত্রাও একটি সাতিশয় আনন্দকর ব্যাপার। কিন্তু সে বিষয় এখানে আর অধিক কিছু বলিব না। কারণ ইতিপূর্ব্বে "বামাবোধিনীতে" চন্দনতলার চাপ নামক প্রবন্ধে এ বিষয় বিশদরূপে লিখিয়াছি।

রাসযাত্রায় জগন্নাথ দেবের একটি বেশ হয়, সে বেশের নাম "রাজবেশ।" রাজ বেশে" জগন্নাথ দেবের সোণার হস্ত পদ দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত রাস যাত্রায় অন্য কোন বাহ্যাড়ম্বর নাই।

ঝুলন যাত্রার পরে একদিন রাত্রিযোগে জগন্নাথদেবের "বনভোজন" ব্যাপার সংসাধিত হয়। এই উপলক্ষে জগন্নাথের প্রতিনিধি মদনমোহন রামকৃষ্ণ প্রকাশ্য বারাণ্ডায় আনীত হন। একজন উড়িয়া লোক একটি ঝুড়ি পূর্ণ করিয়া কতকগুলি ছোট ছোট বনফল আনয়ন করে। অনন্তর মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সেই সব ফল ঠাকুর-দিগকে নিবেদন করিয়া দেওয়া হয়। এই ফল আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত, কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে ইহার সঙ্গে আমাদের দেশের বকুল ফলের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ঠাকুর-নিবেদন করা হইলে এই প্রসাদী ফল লইবার জন্য একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। পাণ্ডা মহাশয়গণও এই ফল দুটি চারিটি লোকের হস্তে অর্পণ করে আর পয়সা আদায় করে।

অনন্তর শ্রীমন্দিরে বারমাস প্রতি অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী ইত্যাদি পুণ্য তিথিতে অনেক আনন্দ উৎসব হয়। এই সব সময় এত লোকের ভিড় হয়, যে যেন লোকেই লোককে গ্রাস করে! (ক্রমশঃ)।

আত্মোন্নতির উপায়।

আত্মোন্নতির উপায় সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে আত্মোন্নতি বলিতে কি বুঝায় ও তাহার প্রয়োজনীতা কি সে বিষয়ের কিছু উল্লেখ করিবার প্রয়োজন আছে।

মানুষের দেহও আছে, আত্মাও আছে। মাতৃগর্ভে দেহের গঠন হয়, ভূমিষ্ঠ হইলে সেই দেহ বাড়িতে থাকে; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহ পরিপুষ্ট হইয়া সংসারের কাজ করে। যত বুড়া হয়, তত দেহ শুকাইয়া ক্ষীণ হয় এবং অবশেষে মৃত্যু আসিয়া তাহাকে অধিকার করে,—শেষকালে দেহ শ্মশানে দগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু আত্মা ওরকম নয়। দেহের ক্ষতিতে

আত্মার ক্ষতি হয় না। দেহ বিনষ্ট হইলেও আত্মা বিনষ্ট হয় না এবং মরণের পরও আত্মা পরলোকে বাস করে।

যদি আমরা দিবারাত্রি জড়পদার্থের মধ্যে বা সংসারে আবদ্ধ থাকি, সাংসারিক উন্নতির জন্য দিনরাত্রি ব্যতিব্যস্ত থাকি, তাহাহইলে আমাদের মন এত জড়ীভূত হইয়া পড়ে, আর দৃষ্টি এত মোটা হইয়া যায় যে কোন চেতন পদার্থ আছে, শরীর ছাড়া আবার যে একটা আত্মা আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অনবরত জড় বিষয় ভোগ করিতে থাকিলে মনটাও জড়প্রায় হইয়া দাঁড়ায়; তখন জড় ভিন্ন আর কিছুই বুঝিতে বা ধারণা করিতেই পারা যায় না; কাজেই জড়ের উন্নতিতে সুখ আর তাহার অবনতিতেই দুঃখ পাইতে হয়। তখন, আত্মা আছে তাহা বুঝা যাইবে কেমন করিয়া?

কিন্তু বাস্তবিক আত্মাই মনুষ্যের প্রধান ও মূল অংশ। আমরা সর্ব্বদা ভাবিয়া দেখি না বলিয়া উহার ধারণা করিতে পারি না। কিন্তু একটু স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে আত্মাই আসল মানুষ, শরীরটা তাহার হাতের যন্ত্র। আত্মাই শরীরকে চালায়, হাসায়, কাঁদায়, সুখ দুঃখ বোধ করায়। আত্মা শরীর ছাড়িলে ইহার আর শ্রী থাকে না, তখন ইহা গলিয়া পচিয়া যায়; কেননা উহা জড়। কিন্তু আত্মা জড়ের মত নহে। জড় ভাঙ্গে, পচে, গলে, নষ্ট হয়, আত্মা এ সব কিছুই হয় না। শরীর ও আত্মা এ দুটি একত্রে থাকিলেও দুইটি আলাদা আলাদা জিনিষ —একটি জড় আর একটি চেতন। জড়ের উপাদান রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ—সে সব চক্ষু, জিহ্বা, কর্ণ, ত্বক্ ও নাসিকা দিয়া আমরা অনুভব করি। তাহাদের দৈর্ঘ্য আছে, বিস্তার আছে, রং আছে, স্বাদ আছে। কিন্তু আত্মার এ সব উপাদান ও গুণ কিছুই নাই। আত্মার উপাদান জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছা। এ সকল চক্ষু কর্ণ দ্বারা অনুভব করা যায় না—কিন্তু মনে মনেই বুঝা যায়। আত্মাই জানে, আত্মাই ভাবে ও আত্মাই প্রীতি করে এবং আত্মাই সব কাজ করিতে ইচ্ছা করে। তাই অসত্য জিনিষ না জানিয়া সত্য জিনিষের জ্ঞান, মন্দ চিন্তা না করিয়া ভাল চিন্তা করা, অসৎ বিষয়ে প্রীতি না করিয়া সৎ বিষয়ে প্রীতি এবং মন্দ কাজে ইচ্ছা না করিয়া ভাল ইচ্ছা কাজে ইচ্ছা করাই আত্মার পক্ষে দরকার। তাহা করিলে আত্মা ইহ সংসারে যতদিন থাকে, ততদিন জগতেরও কল্যাণ করে, আপনিও বেশ আনন্দে থাকে এবং শরীর ছাড়িয়া শেষকালে পরলোকে গেলেও তাহার সদ্গতি হয়। এখন বুঝা যাইবে যে, আত্মা মন্দ ছাড়িয়া ক্রমাগত ভাল বিষয়ে নিজের জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছাকে নিযুক্ত করিতে থাকিলে, তাহাকেই আত্মোন্নতি বলে আর যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে তাহা করা যায়, তাহাই আত্মোন্নতির উপায়।

আত্মোন্নতি করা কেন যে দরকার তাহা কেহ কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে পারে না। সকল মানুষের জীবনেই এমন এক সময় ও অবস্থা আসে, যখন প্রত্যেকেই নিজে নিজে ইহা বেশ বুঝিতে পারে। কিন্তু তবু এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলে লাভ বই লোকসান নাই। আমরা যে সংসারের উন্নতির জন্য এত ব্যস্ত হই, এত পরিশ্রম করি, ভাবিয়া দেখিলে তাহা দুই দিনের জন্য—দুই দিনেই বিনষ্ট হয়। কিন্তু আত্মার উন্নতি চির দিনের জন্য। যদি কোন ভগিনী হিংসা দ্বেষ, স্বার্থবাসনা ও অতৃপ্তির তাড়নায় অস্থির হইয়া নিজ আত্মার ক্ষুদ্রতা ও মলিনতা অনুভব করিয়া থাকেন এবং প্রীতি পবিত্রতা ও ধর্ম্মের বিমলানন্দ বিন্দু পরিমাণও কোন সময়ে সম্ভোগ করিয়া থাকেন—তবে তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে আত্মাকে সাংসারিক জড় বস্তু হইতে মুক্ত করিয়া জ্ঞান ধর্ম্ম ও সদ্‌ভাবের দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত করা আবশ্যক। আমরা যে শুভ মুহূর্ত্তে নিজের অভাব, ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা না বুঝি তাহা নহে; আত্মার উন্নতি করাই যে দুর্লভ মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ ইহাও যে না বুঝি এমন নহে; আত্মার উন্নতি করিতে আমাদের মন যে চায় না, তাহাও নহে; কিন্তু আমাদের আগ্রহ ও উৎসাহ এত কম, আর আমাদের শক্তিও এত সামান্য যে আমরা অল্পমাত্র চেষ্টা করিয়াই আবার নিরাশ হইয়া পড়ি এবং শেষকালে আগের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া অন্ধকারে পড়িয়া থাকি। সেই জন্য আমাদের এমন কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা উচিত যাহা দ্বারা নিরাশা ও নিশ্চেষ্টতা দূরে গিয়া আত্মোন্নতির ভাবনা ও চেষ্টাই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে আমরা সে সব উপায় কেমন করিয়া জানিব? তাহার উত্তর এই যে আগে ভাবিয়া চিন্তিয়া, পুস্তক পড়িয়া, গুরুজনের উপদেশ লাভ করিয়া সেই সব উপায়গুলি জানিতে হইবে। তার পর সেইমত নিজে চলিতে হইবে। কোন বিষয় ভাল করিয়া আগে জানা না থাকিলে আমরা তাহা কাজে আনিতে পারিব না। কি করিলে শরীর সুস্থ থাকে, কি করিলে আমাদের সংসারের উন্নতি হয়, এ সব যদি আমরা আগে চিন্তা ও আলোচনা দ্বারা ভাল করিয়া জানিতে ও বুঝিতে না পারি, তবে সেই মত চলিয়া উত্তম ফল লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সংসার আর শরীরের বিষয়ে যেরূপ নিয়ম, আত্মার বিষয়েও সেইরূপ নিয়ম খাটে। কি করিলে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয়, কি করিলে স্বার্থপরতা, মলিনতা, ক্ষুদ্রতা—এই সকলের উপরে উঠিয়া আনন্দ লাভ করা যায় এবং কি করিলে আমরা পশুভাব হইতে মুক্ত হইয়া দেবভাব লাভ করিতে পারি, সে সকল উপায়ও আগে জানা না থাকিলে

আমরা সেইমত চলিতে পারি না। আত্মার নিয়ম সকল ভাল করিয়া আগে জ্ঞান দ্বারা বুঝিয়া তার পর সেই নিয়মে জীবন পথে অগ্রসর হওয়াকেই আত্মোন্নতি বলে।

আত্মোন্নতির কয়েকটী উপায় আমি যথাক্রমে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্ব-প্রধান উপায় গুরুভক্তি ও বাধ্যতা। ভক্তি ও বাধ্যতা নহিলে আমাদের অস্ফুটন্ত আত্মা ভাল করিয়া ফুটে না। অসহায় শিশু যেমন জননীর সাহায্য ভিন্ন বাঁচিতে পারে না, পদে পদে তাহার পক্ষে জননীর সাহায্য প্রয়োজন হয়, তেমনি আমাদের শিশু আত্মার পক্ষেও নিত্য সঙ্গী কোন গুরুর প্রয়োজন। ইহসংসারে স্বামীই স্ত্রীলোকের পরম গুরু। স্বামী যে আদর্শ দেখান, যে সুশিক্ষা দেন, যে সুপথে পরিচালিত করেন, ভক্তি প্রীতি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে, তাঁহার একান্ত বাধ্য হইয়া, সেই আদর্শের অনুসরণ, সেই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এবং স্বামীর অনুগামিনী হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত প্রণালীতে তাঁহারই সহায়তায় নিজের জীবনকে গড়িতে হইবে। সাধারণতঃ স্বামী বড়, স্ত্রী ছোট; স্বামী গুরু, স্ত্রী শিষ্যা; স্বামী দেবতা, স্ত্রী ভক্ত। স্বামীকে অবহেলা করিয়া তাহার অবাধ্য হইয়া, আপনার উপরে নির্ভর করিলে অহঙ্কার ও উদ্ধতভাব বাড়ে; জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিদ্যা, চরিত্র কিছুই লাভ হয় না। কিন্তু আমি মূর্খ—আমি অজ্ঞান, আমি দুর্ব্বল, এই রকম মনের বিনীত ভাব লইয়া স্বামীর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে আত্মার প্রকৃত কল্যাণ হয়। যে নারী মনে করেন স্বামীর প্রতি ভক্তি ও তাঁহার বাধ্যতা ব্যতীত আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইয়া কেবল বই দেখিয়া একাকী আত্মোন্নতি করিবেন, তাঁহার নিতান্তই বুঝিবার ভুল। তিনি "সহধর্ম্মিণী” কথাটার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই।

এরূপ অনেক পতিপ্রাণা মহিলা আছেন, যাঁহাদের পক্ষে এই কথাটার উল্লেখ করা বাড়ার ভাগ মাত্র। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আর যে সকল ভগিনীর পক্ষে এই নিয়মের প্রয়োজন আছে, তাঁহারাও আমাকে অনুগ্রহ করিয়া ইহা ভাবিয়া মার্জ্জনা করিবেন যে, আমি সাধারণভাবে নারী জাতির কল্যাণের জন্যই এই উপায়টীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিয়াছি এবং উল্লেখ করিয়াছি।

দ্বিতীয় উপায় সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গের এমনি আশ্চর্য্য প্রভাব যে তদ্দ্বারা অজ্ঞাতসারে আমাদের দোষগুলি সংশোধিত হইয়া সদ্ভাবগুলি ফুটিয়া উঠে। সাধু ব্যক্তির অপরিমেয় ভক্তি, প্রেম, উদারতা-দেব নিষ্ঠা দেখিয়া অসাধু লজ্জিত হইয়া নিজকে ধিক্কার দেন ও অলক্ষ্যে সাধু ব্যক্তির সদ্গুণ সকলের অনুকরণ করেন। যেমন সাধু-সঙ্গ বাছিয়া লইতে হইবে, তেমনি আমাদিগকে লক্ষ্যবিহীন, লঘুচেতা অগঠিত-চরিত্র ব্যক্তিগণ হইতে যতদূর সম্ভব দূরে থাকিতেও প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

সাধু সাধ্বী নর নারীগণের সংস্পর্শে আসিলেই আমরা নিজেদের কদর্য্যতা বুঝিতে পারি ও এই রক্ত মাংসের শরীর ধারণ করিয়াও যে মানুষ দেবতাবের ও আত্মপ্রসাদের অধিকারী হইতে পারে, তাহারই আদর্শ পাই।

তৃতীয় উপায় সদ্‌গ্রন্থ পাঠ। সৎসঙ্গ সকলের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে; বিশেষতঃ পরাধীনা নারীগণের পক্ষে ইহা অনেক সময় জুটিয়া উঠে না। সে স্থলে সাধু সাধ্বী নর নারীগণের জীবনচরিত পাঠ করিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গ লাভ করিতে হয়। ইহা দ্বারা নিজ নিজ জীবনের ত্রুটী ও অভাব বুঝিতে পারা যায়। জ্ঞানিগণের চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া তাঁহাদের সহিত নিজ চিন্তার তুলনা ও বিনিময় করিয়া স্বীয় স্বীয় চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি করিতে হয়। সাধু ও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সহিত এরূপ সম্পর্ক না রাখিলে জীবনের লক্ষ্য স্থির হয় না, প্রাণে সুন্দর আদর্শ জাগ্রত হইয়া আমাদিগকে সেইরূপ হইবার জন্য ব্যাকুল করে না, জীবনের চিন্তা-স্রোত খুলে না; অবশেষে স্রোতোহীন নদীর ন্যায় তাহা মলিন ও পঙ্কিল হইয়া পড়ে এবং তখন আমরা ভ্রান্তপথ অবলম্বন করিয়া জীবনের মহা অনিষ্ট সাধন করি।

আত্মোন্নতি করিবার চতুর্থ উপায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা। আমাদের শক্তি অতি ক্ষুদ্র ও ইচ্ছা অতি দুর্ব্বল। আমরা অনেক সময় সাধু জীবনচরিত ও জ্ঞান-গর্ভ পুস্তক পাঠ করিয়া কত মনের মত উপদেশ প্রাপ্ত হই এবং নিজের অভাব ও ত্রুটী বুঝিতে পারি ও কত বিষয় সত্য বলিয়া বুঝি; কিন্তু সুবিধা অসুবিধার মধ্যে—সুখ দুঃখের মধ্যে সে সকলকে নিশ্চিত মঙ্গলকর জানিয়া স্থিরভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প না হইলে সকলই বৃথা। দৃঢ়-সংকল্পবিহীন আত্মার পক্ষে উন্নতিসাধন অতি দুষ্কর ও দুঃসাধ্য।

আত্মোন্নতি করিবার পঞ্চম উপায় লব্ধ উপদেশ ও জ্ঞানকে শুধু চিন্তায় আবদ্ধ না রাখিয়া কার্য্যে পরিণত করা। শুধু চিন্তামাত্রে জীবন লাভ হয় না; তাহা যদি হইত, তবে জ্ঞানী ব্যক্তিগণের বিবৃত যুক্তি ও বিচার-সঙ্গত সুন্দর সুন্দর শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ম সকল জ্ঞাত হইয়াও শত শত মানবের শরীর রুগ্ন এবং মন বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ থাকে কেন? তাহার কারণ এই যে আলস্য বশতঃ তাহারা সেই নিয়মগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হয় না। অতএব কোন বিষয়ের মত গঠিত হইলে, কোন কার্য্য অবশ্য-করণীয় স্থির হইলে, তাহা অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করা উচিত। তাহা না হইলে কথায় বড় হইয়া কার্য্যের সময় এক গাছি তৃণ অপেক্ষাও দুর্ব্বল হইতে হয়। তাহাতে কিছুই হয় না। ইহাতে লোকের নিকট কিছু পরিমাণে প্রশংসা লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু এরূপ কপটতা দ্বারা আত্মার অত্যন্ত ক্ষতি হয়। অনেক সময় যাহা ন্যায়-সঙ্গত ও

উচিত বলিয়া জানা যায়, লোক-নিন্দা ও সাংসারিক অসুবিধার ভয়ে তাহা করা হইয়া উঠে না। তাহাতে আত্মা হীনতেজ হইয়া দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। অতএব কর্ত্তব্য পালনে সৎসাহস অবলম্বন করা প্রয়োজন।

আত্মোন্নতির ষষ্ঠ উপায় হৃদয় ও মনের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা। কাহারও প্রতি বিদ্বেষ ভাব বা কোন কুটিল ভাব পোষণ করিতে নাই। মন যদি কোন একটা প্রবৃত্তি বিশেষের অধীন হয়, তবে সত্য ও শুভ ভাবকে হৃদয়ে নিয়ত পোষণ করিতে যত্নবান্ হইতে হইবে।

চিন্তাশীলতা আত্মোন্নতির সপ্তম উপায়। আমোদের স্রোতে, অবস্থার স্রোতে সর্ব্বদা নিজকে ঢালিয়া দিতে নাই। ইহাতে জীবন হইতে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা চলিয়া যায়। প্রত্যেক কার্য্যের ফলাফল বিবেচনা করিয়া যাহা শ্রেয়, তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে; যাহা প্রেয়, তাহাকে পরিহার করিবে। চিন্তাশীলতায় আত্মার গাম্ভীর্য্য হয়, এবং উহা আমাদিগকে লক্ষ্য-পথে সুস্থির রাখে।

আত্মোন্নতির পক্ষে অষ্টম উপায় দশজনে মিলিত হইয়া সৎপ্রসঙ্গ দ্বারা চিন্তা ও ভাবের বিনিময় করা। ইহাতে মনে নিরাশা স্থান পায় না; সন্দেহ, অবিশ্বাস, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা দূর হয় এবং বিশুদ্ধ মত গঠিত হয়; শ্রদ্ধার সহিত ধর্ম্মকথা—জ্ঞানের কথা—নীতি কথা ও সকল প্রকার সৎকথা শুনিতে হয়। তদ্দ্বারা উপকার লাভ হয় এবং হৃদয়ে ভক্তির প্রবাহও বৃদ্ধি হয়। শ্রদ্ধাবিহীন লঘু অন্তঃকরণে কোন সৎ-বিষয় স্থান পায় না।

আত্মোন্নতির পক্ষে আত্মশাসন ও আত্মসংযম একান্ত প্রয়োজন। আত্ম-শাসন না থাকিলে দুর্ব্বল ইচ্ছা শক্তি প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া যায়। যাহা কিছু ন্যায়সঙ্গত ও করণীয় বলিয়া বুঝা যায়, সে সকলের প্রতি সন্দেহ জন্মাইয়া দেয়। তীব্র দৃষ্টিতে দুর্ব্বল ইচ্ছাকে শাসন করিয়া তাহার উপর জয়লাভ করিতে হয়। আত্ম-সংযম ব্যতীত কি শারীরিক কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক কোন বিষয়েই উন্নতি লাভ করা যায় না।

আত্মোন্নতির আর একটি প্রধান উপায় আত্মপরীক্ষা। সাংসারিক কোলাহলে আমরা অধিকাংশ সময় নিজেকে ভুলিয়া থাকি; সে সময় নিজের উন্নতি অবনতির কথা কিছুই মনে থাকে না; সুতরাং সাংসারিক কার্য্যের ভিড় হইতে একটু অবসর গ্রহণ করিয়া নিজের দোষ-গুণ তীব্র দৃষ্টিতে বিচার এবং অভাব ত্রুটী বুঝিয়া লইয়া তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিতে হয়।

আত্মোন্নতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়—ইষ্ট-দেবতার নিকট আত্ম-নিবেদন। আপনার ক্ষুদ্রতা, দুর্ব্বলতা ও অভাব ত্রুটী বুঝিয়া তাহা সরল ও ব্যাকুলভাবে ইষ্টদেবতাকে জানাইলে, এবং তাঁহার নিকট সৎপথে যাইবার বল ভিক্ষা করিলে, দেবতা মনে বল সঞ্চার করেন। আপনার উপর নির্ভর করিলে অহঙ্কার বাড়ে; মনে উদ্ধতভাব

ও অন্ত সকলকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার ভাব আসে। কিন্তু আমি মূর্খ, আমি অজ্ঞান, আমি দুর্ব্বল—এ রকম ভাবে দেবতার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার কাছে আত্ম-নিবেদন করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ করেন।

শ্রীমতী সরোজিনী বসু।

তরুবালা।

(৪৩০-৩১ সংখ্যা ২৪২ পৃষ্ঠার পর)।

কিছু দিন পরে তরুবালা স্বামিগৃহে আসিলেন। এবার মনে মনে ভাবিলেন, "দেখি এবার কেমন ক'রে এরা আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে কদিন খায়—এরা যাহাতে শীঘ্র পৃথক্ হয়, আমি তাহারই উপায় করিব।" সে চাঁপা ঝিকে হস্তগত করিল। সে তাহাকে শিখাইয়া দিল, "দ্যাখ্ চাঁপা, আমি যখন বড়দিদীর কিম্বা ঠাকুরঝির নামে কোন কথা বলিব, তুই অম্নি আমার কথায় সায় দিবি আর আমার মন বুঝিয়া কথা কহিবি—আমি তোর ছেলের জামা কিনিয়া দিব—তোর ভাল করবো।"

একদিন রবিবার দুপর বেলা—কাহারও আহারাদি হয় নাই। ললিতকুমার উপরের ঘরে শয়ন করিয়া আছেন—তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। তিনি ভাত চাহিতেছেন। তরুলতা একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া ঝটিতি বারাণ্ডায় আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, "চাঁপা—ও—চাঁ-পা।" চাঁপা নীচে ছিল, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "কেন গো ছোট মা!" তরু স্বামীকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিল, "বড়দিদি কি কচ্চেন, ঠাকুরঝি কোথায় গেল? মানুষগুলো যে ক্ষিধেতে চিংড়ীপোড়া হচ্চে।" চাঁপা একটু ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে ব্যঙ্গপূর্ব্বক কহিল, "হুঁ—তাঁদের যেমন কাজ! এখানে কেও নাই।" তরু অম্নি যোপ বুঝিয়া কোপ মারিলেন। বলিলেন "তবে বুঝি বামুনদের বাড়ীতে গল্প কর্ত্তে গেছেন।" চাঁপা কহিল, "তা বৈকি—তাঁদের আর কি কাজ? এখন তুমি নেবে এস—ভাত বাড়িয়া গুছিয়ে গাছিয়ে সব নিয়ে যাও, তবেত বাবুর খাওয়া হবে।" তরু কল্পিত রাগভরে উপর হইতে নামিয়া আসিলেন এবং মনে মনে বলিলেন, "কুমীরের সঙ্গে বাদ ক'রে জলে ক দিন বাস করবে কর দেখি?"

পাকশালা একটু দূরে অবস্থিত, তথায় গিরিবালা ও স্বর্ণমণি উভয়েই উপস্থিত, তাহারা ছোট বৌএর দুষ্ট বুদ্ধির অভিনয় কিছুই দেখে নাই, সুতরাং কিছুই জানিতে ও বুঝিতে পারে নাই। ছোট বৌ ভাত

আনিয়া স্বামীকে দিল—তিনি ভাত খাইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

এইরূপে ছোট বৌ স্বামীকে উত্তেজিত করিবার জন্ত দিন দিন নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। স্বামী কিছুতেই উত্তপ্ত হয়েন না দেখিয়া ছোট বৌ অবশেষে প্রকাশ্যে সামান্ত অছিলায় জা ও ননদের সহিত ঝগড়া আরম্ভ করিল। একদিন বড়বৌএর ঘর হইতে একটা বিড়াল বাহির হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, ছোটবৌ অম্‌নি চাঁপাকে সাক্ষী করিয়া চেঁচাইয়া কহিল, "দ্যাখ চাঁপা, দিদীর ঘরের বিড়াল আমার ঘরের দুধ ফেলিয়া গ্যাল—খোকা কি খাবে, বাবু কি খাবে? এমন কল্লে আর পারিনে।" চাঁপা কোথায় ছিল, তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, "তাই তো গা—সব দুদ যে ফেলে দিয়েছে।" বলা বাহুল্য—"যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ"—যেম্‌নি মনিব তেম্‌নি ঝি, মণি কাঞ্চনের যোগ। তক ইসারা কল্লে চাঁপা দুদের পাতরটা লইয়া, উপরের ছাদ থেকে পিছনদিকের বনে সব দুদ হড়্‌হড়্‌ করিয়া ঢালিয়া আসিল।

রাত্রিকালে খাইবার সময় ললিতকুমার ও খোকা বাবুর দুদ নাই বলিয়া একটা গোলমাল পড়িয়া গেল। ছোটবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? দুদ কি হয়েছে?" ছোটবৌ অম্‌নি দশখানা করিয়া স্বামীর নিকট বড়বৌয়ের ও ক্ষান্তমণির নামে লাগাইল। সে কহিল "দিদীর আর ঠাকুরঝির জ্বালায় কিছু থাকিবার ত যো নাই;—দিদীর বিড়ালটা দিদীর ঘর থেকে এসে সব দুদ ফেলে, ছড়িয়ে, খেয়ে চলে গেছে—আর ঠাকুর ঝির—আমাদের বেলা সব ব্যাগার ঠালা কাজ—একটু যত্ন নাই—একটু আয়িত্তে নাই—স্বচ্ছন্দে দুদের পাতরটা এলো ফেলে চলে গেল—হ'ত বড় ঠাকুরের দুদ, ত, দেখ্‌তে কত সাবধান ও যত্ন করে রাখ্‌তো—বুকের কল্‌চে হ'ত—এ আমাদের কি না। তোমাকে বল্‌চি বার বার তফাৎ হও, তুমি তা শুন্‌বে না, যা ইচ্ছা তাই কর, কিন্তু আমাকে বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিও।" এই বলিয়া ছোটবৌ তথা হইতে চলিয়া আসিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইল। ললিতকুমার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এরূপ করিলে ক দিন চলিবে? দেখিতে পাইতেছি আমাকে পৃথক্ হইতে হইবে। এক দাদার জন্য একটু ভাবনা—তাঁহার নিকট কতকটা ঋণী, তিনি আমাকে মানুষ করিয়াছেন। তা কি করিব? তিনিত বড় বৌএর বশীভূত—বড় বৌ যে দিকে নাচাইবে, সেই দিকেই নাচিবেন। আর ক্ষেন্তি—ওর জন্ত আমার কিসের ভাবনা। পোড়ারমুখী সর্ব্বদাই ছোট বৌএর সঙ্গে ঝগড়া কর্‌বে—মরুগ্‌গে।" ললিতকুমার এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আধপেটা খাইয়া বাহিরে গেলেন। যাইবার সময় চাঁপাকে সিঁড়ির কাছে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চাঁপা! দুদ নাই কেন রে?" চাঁপা এরূপ কার্য্যে সিদ্ধহস্ত,

তৎক্ষণাৎ কহিল, "বড় বৌঠাকুরণের বিড়ালে নষ্ট করিয়াছে—ছোট দিদী ত দুধ ঢাকা দিয়ে যান না।" চাঁপা এক ইটে দুই পাখী মারিল! ললিতকুমারের বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইল। তিনি মনে মনে পৃথক্ হইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

বড়বৌ গিরিবালা অতি ভাল মানুষের মেয়ে। মুখে কথাটী নাই, ঝগড়া কাহাকে বলে জানে না। ঐ দেবর ও জায়ের জন্য শরীর মাটি কর্‌চেন। তবু সুখ্যাতি নাই, ভাল কথা নাই, সন্তোষ নাই। তাহার অসাধারণ সহিষ্ণুতা, কার্য্যতৎপরতা, আত্মীয় জনের প্রতি কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, সদা প্রফুল্লতা তাহার স্বভাবকে অতি মনোহর ও সুখপ্রদ করিয়াছিল। যে দেখিত, তাহার চিত্ত বিমোহিত হইত। সে যে দেবরের জন্য তাহার গায়ের সমস্ত গহনা খোয়াইয়াছে, তজ্জন্য একটীবারও ভাবিত না, ইহাও তাহার মহত্ত্বের একটী পরিচায়ক। কান্তমণি একটু উদ্ধত-স্বভাবা, সে ভাবিত, "আমি বাপের মেয়ে, দাদা ও ছোট দাদা আমার ভাই—আমার মায়ের পেটের ভাই—আমার একটু জোর আছে বৈ কি।" সে এক কথা হইলে ছোট বৌউকে দশ কথা শুনাইয়া দিত। কাহারো তোয়াক্কা রাখিত না। ছোট বৌ ভাবিত, "আমি ডাক্তারের স্ত্রী, আমার স্বামী যাহা উপার্জ্জন করে, দশ জনকে খাওয়াইয়া ভূট করে, আমার কিছুই জমে না, আমার উপর আবার জোর!" সুতরাং কান্তমণি ও তরুবালার মধ্যে সাপে নেউলের সম্বন্ধ ছিল।

মাধব ভ্রাতৃগতপ্রাণ—তিনি ভাবিতেন "ললিতকে আমি হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছি, সে আমা বই কাহাকে জানে না, সে আমার বাধ্য, আমি যাহা করি তাহাতে তাহার অটল বিশ্বাস, সে আজও পর্য্যন্ত আমার মুখ পানে চাহিয়া কথা কহে না। ভগবানের কৃপায় ভায়ারও পড়্‌তা ভাল, বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। এইবার বোধ হয় আমাদিগের সংসারটা একটু উন্নতির পথে চলিবে। এইক্ষণে কলিকাতায় একখানি বাড়ী করিতে পারিলে আমাদিগের পূর্ব্ব মান সম্ভ্রম বজায় থাকিতে পারে।" মাধব এইরূপ আশার কোমলাঙ্কে শয়ন করিয়া সুখময় স্বপ্নরাজ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে তাঁহার আশা মরীচিকামাত্র—তিনি ভ্রাতৃস্নেহের মায়া মরীচিকায় মরুভ্রমে দিব্য সরোবর সন্দর্শন করিতেছেন—তাঁহার নয়নসমীপে সুন্দর বিটপিরাজি সুমিষ্ট ও মনোহর ফল ফুলে সুশোভিত হইয়াছে, কিন্তু হায়! নিদ্রাবসানে কিছুই থাকিবে না। হ'লে হয় কি—ভ্রাতৃস্নেহ ত বড় সহজ জিনিস নয়। তিনি সেই অসীম এবং মায়াময় ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া ওই-রূপ ভাবিতেছেন। কিন্তু কালের গতি কি কুটিল! বিধাতার বিড়ম্বনায় সকল বিপর্য্যয়ই সম্ভব।

ললিত আজ কাল আর সে ললিত

নাই—তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে দাদাকেও একটা কঠোর বাক্য বলিতেও আরম্ভ করিয়াছে। ছোট বৌ জ্বাল দিতে ছাড়িতেছে না, অষ্টপ্রহর লাগিয়া আছে, ললিতের মনকটাহ ক্রমশই উত্তপ্ত হইতেছে। ছোটবৌ তাঁহার গঙ্গাজলের কাছে দিনের মধ্যে দশবার গল্প করিতে যান, তাহাতে কিছু অপরাধ হয় না, আর ক্ষান্তমণি কিম্বা গিরিবালা একবার অবসরক্রমে কাহারও বাটীতে যাইলে রক্ষা নাই, তাহাতে হুলস্থূল ব্যাপার হইয়া থাকে। এই কারণে ঝগড়া হওয়ার তরু অতি কষ্টে একদিন বাটী হইতে বাহির হয় নাই। তাহার গঙ্গাজলকে দেখিতে না পাইয়া তাহার পেট ফুলিয়া উঠিয়াছিল। পরদিবস গঙ্গাজলের বাটীতে বেড়াইতে যাইলে গঙ্গাজল নয়নতারা হাসিতে হাসিতে তামাসা করিয়া কহিল,—

"একি! ডুমুরের ফুল যে!"

কেন ভাই?

কাল আসা হয়নি কেন?

তোমার কাছে না এসে কি একদণ্ড থাক্‌তে পারি? পেট হুড়্‌হুড়্‌ করে যে।

বলি, কাল কি হয়েছিল?

হবে কি ভাই, তুমিত সবই জান, আমার জা আর ননদ একযোট হয়ে আমাকে এখান থেকে তাড়াবার চেষ্টায় আছে—আমার সঙ্গে কাল তুমুল ঝগড়া। আমাকে বলে কি না, "ঘরখাকী, মনভাঙ্গানী, সংসারে যা কিছু সামান্য কথা সব গিয়া স্বামীর কাণে তোলে—তার কাণ ভারি করে, ওর ইচ্ছে আমরা দূর হয়ে যাই—আর ও একলা রাজত্ব করে—পয়সার পুঁটুলি বাঁধে, আর গয়না গড়ায়। তা ভাই তোমরা ত সব দেখ্‌তে পাচ্চো কার দোষ?" এই বলিয়া তরুবালা চক্ষের জলে কাপড় ভিজাইতে লাগিল। ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে হাত দিয়া চোক রগড়াইতে লাগিল, চোক লাল হইয়া উঠিল। নয়নতারা গঙ্গাজলকে বড় ভালবাসে, সে তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "আর কাঁদিস্‌নে ভাই চুপ কর, আমি এর ব্যবস্থা করিব।"

তরু, নয়নতারার নিকট যে সমস্ত কথা কহিল সবই মিথ্যা। সে জানিত গোকুল বাবু—নয়নতারার স্বামী তাহার স্বামীর একজন বন্ধু। সে গঙ্গাজলের নিকট কাঁদিলে, গঙ্গাজল তাহার স্বামীর দ্বারা তাহার স্বামীকে কিছু না কিছু বলাইবে। তাহা হইলে তাহার মনের বাসনা কতকটা পূর্ণ হইবে।

সেই দিন গোকুল বাবু বাটীতে জল খাবার খাইতে আসিতেছেন। নয়নতারা কটিদেশে হস্ত সংলগ্ন করতঃ বক্রগ্রীবায় স্ফীতবক্ষে, কম্পিত ক্রোধব্যঞ্জক মুখে ঘরের দরজা আটকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

গোকুল বাবু গৃহে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখেন, "গৃহিণীর ভীমা মূর্ত্তি—মুখ গম্ভীর মেঘাবৃত, এখনি যেন কিছু বর্ষণ করিবেন। তিনি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এ কি! এ কি ভাব?"

(কল্পিত ক্রোধভরে) ভাব ভাল।

কি রকম বল দেখি—কি হয়েছে ?

তোমরা পুরুষ বড় বেইমান জাত—তোমরা মেয়ে মানুষের দিকে একবার চাও না। মেয়ে মানুষটা বাঁচ্‌লো কি মল, তার কি কষ্ট হচ্চে, এ খপরটা তোমরা রাখ না—তোমাদের আপনাদের আরাম ও সুখ হ'লেই হ'ল।

কেন বল দেখি ?

ললিতবাবু না তোমার একজন বন্ধু ?

তা কি হয়েছে ?

তার স্ত্রী তরুবালা আমার গঙ্গাজল জান ত—

জানি।

ললিতবাবুর বড় ভাজ আর বোন দুজনে আমার গঙ্গাজলকে দেখ্‌তে পারে না। তারা হিংসায় মরে। গঙ্গাজল একটু ভাল খেলে পর্‌লে, তারা আর বাঁচে না—বুক ফেটে মরে। তার স্বামী বাড়ীর মধ্যে রোজগারে, তা সে একটু ভাল খায় পরে যদি, তাতে তাদের চোক টাটায় কেন ?

তা আমাকে কি কর্ত্তে হবে বল ?

তুমি বেশ করে ললিত বাবুকে ব'লে আস্‌বে যেন তিনি আর কাহারো কথা না শুনেন—স্ত্রীকে কোন কষ্ট না দেন। গঙ্গাজল বড় ভাল মানুষ। আমি তাহার কষ্ট শুনিতে পারি না।

" এই কথা। আচ্ছা তা হবে—এখন দরজা ছেড়ে দাও। নয়নতারা হাসিতে হাসিতে ভিতরে আসিলেন এবং আসন পাতিয়া জায়গা করিয়া স্বামীর জলখাবার দিলেন।

পর দিবস প্রাতে গোকুলবাবু মর্ণিং-ওয়াকে বহির্গত হইয়াছেন। রাস্তার-ধারে বৈঠকখানায় ললিতবাবু চা খাইতেছেন আর সট্‌কায় আলাপ করিতেছেন। গোকুলবাবু তথায় আসিতে না আসিতে ললিতবাবু সম্ভ্রমে উঠিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহার করমর্দ্দন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"হ্যালো! গোকুলবাবু, হাউডু ইউ ডু?"

"কোয়াইট ওয়েল, থ্যাঙ্ক ইউ"

ইংরাজী সম্ভাষণের পর গোকুলবাবুকে একখানি কেদারা দেওয়া হইল, তিনি তাহাতে বসিলেন। ডাক্তারবাবু অধরে একটু মিষ্ট হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তার পর—কি মনে করে? আর এ দিকেত অনেক দিন আসা যাওয়া নাই।"

"না ভাই—পশ্চিমে গিয়াছিলাম।

এমন সময়ে যে !

একটু শরীরটা খারাপ ছিল, তাই মনে কল্লুম একটু বেড়িয়ে আসি।

কত দূর গিয়াছিলে ?

গিয়াছিলাম হরিদ্বার পর্য্যন্ত।

তা বেশ—বেশ। আমিও মনে কচ্ছি একবার একটু বেড়িয়ে আস্‌বো। (পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে) ক দিন ধ'রে পেট্‌টা কেমন কচ্চে—যা খাই কিছুই হজম হচ্চে না—শরীরটা ভারি অসুস্থ হয়েছে।

আরে তোমরা ডাক্তার লোক। তোমাদের আবার অসুখ বা কি আর পশ্চিমে হাওয়া বদলাইতে যাওয়াই বা কি?

কেন আমাদের অসুখ হ'তে নাই?

তোমরা নিয়মে থাক—অষুদ টষুদ খাও—তোমাদের আবার ব্যারাম কি?

আরে তা জাননা—ব্যারাম না হ'লেও তবু একবার ক'রে যেতে হয়!

কেন?

দশজনে যায়—আমাদের একটু পজিসান্ আছে—আমরা দশজনকে পশ্চিমে যাইতে ব্যবস্থা দিই—আমরা না গেলে তারা যাবে কেন?—আর এটা ফ্যাসান্ অব্ দি ডে।

(ঈষৎ ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে) বটে—বটে—তা—বটে—বটে।

মাধব এমন সময় অতি মলিন বেশে বাটী হইতে বাহিরে যাইতেছিলেন। গোকুলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটি কে হে?"

"ও আমার বাটীর সরকার।"

দ্যাখ—তোমার সেই ভ্রাতাটী কোথায়?

ডাক্তারবাবু তখন একটু দুঃখিতভাবে কহিলেন, "তিনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া দেশে চ'লে গেছেন।"

কেন—ঝগড়া কিসের?

ঝগড়া কিসের? তিনি আমার উপর বড় সন্তুষ্ট নন।

হাঁহে আমিও শুনেছি। লোকটা বড় ভাল নয়। একটা পয়সা রোজগার নাই। যোড়শোপচারে পূজা। পানে চুণ খসিবার উপায় নাই। একটু ত্রুটি হইলে আর রক্ষা নাই। ঘরের চালে আগুণ ধরাইয়া দেন।

(একটু অপ্রতিভ ভাবে) তা তিনি তত নাই হ'ন, আমার বড় ভাজটী সামান্য মেয়ে নন।

ঠিক্ ঠিক্—আমিও শুন্‌তে পাই তোমাকে বড়ই জ্বালা যন্ত্রণা দেয়। তা সে বড় অন্যায়। তোমার খাবে, আর তোমার মাথায় চড়ে যাবে। তুমি আর দেরী ক'র না, সত্বর পৃথক্ হইয়া পড়।

তাই ভাব্‌ছি ভাই, কি করি।

ভাব্‌নার দরকার নাই—তুমি অদ্যই পৃথক্ হও, তা না হ'লে তোমার পরিবারটী মারা যাবে—তুমি উচ্ছন্ন যাবে। গোকুলবাবু এই প্রকার অনেক বুঝাইয়া ডাক্তারের মন ঠিক্ করিয়া দিয়াছেন। তিনি সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া বন্ধুবরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। ললিতবাবু কপোলে কর বিন্যস্ত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "গোকুলবাবু ঘরের কথা সমস্ত কিরূপে জানিতে পারিলেন? যাই দেখি একবার তরুকে জিজ্ঞাসা করি ব্যাপারখানা কি?" বাটীর ভিতর আসিয়া তিনি তরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দ্যাখ, তরু, গোকুলবাবু আজ এসেছিলেন, তিনি আমার ভাজ ঠাকুরনের তোমার উপর উপদ্রব, ক্ষেন্তির ঝগড়া সমস্ত ঘরের কথা বলিলেন—তা তিনি এসব কোথা থেকে জান্‌তে পার্‌লেন?" তরুবালা তৎক্ষণাৎ

স্বীয় স্বাভাবিক চতুরতার সহিত উত্তর দিলেন, "তোমার ভাজ আর বোনের কথা ত কেউ জানে না, তাই তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, কি করে গোকুলবাবু টের পেলেন? পাড়াশুদ্ধ কে না জানে তাহাদের ব্যবহার—হুঁ, যে ঝগড়া করে, বাড়িতে কাক চিল বসিতে পারে না—তুমি ডাক্তার মানুষ, বাইরে বাইরে থাক, তুমি ঘরের খপর কি জান্‌বে? এই প্রকারে গিরিবালা ও কান্তমণি ডাক্তারের নিকট সম্পূর্ণ দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

পর দিবস স্বামী আসিবার সময় বুঝিয়া তরু গণেশকে সাম্‌নের ঘরে ভাত খাওয়াইতে বসিয়াছেন। স্বামী নিজ-কক্ষে প্রবেশ করিলে, তরু মুখ ভার করিয়া, কাঁদ কাঁদ ভাবে তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "তুমি বল সহ্য কর, সহ্য কর—আমি আর পারিনে। এই দেখ এসে, একটা ছেলে খাবে—পাতে কিছু নাই—কি দিয়ে খাওয়াব?" ললিত একটু ইতস্ততঃ করাতে, তরু, "আমার মাথা খাবে, যে না দেখ্‌বে" এই বলিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া তাহাকে টানিয়া আনিল। তথায় তরুর জীবন নাটকের এক দৃশ্য প্রদর্শিত হইল। তরু মন্দ নায়িকা নহে, সে কাঁদতে কাঁদতে কহিল, "এইরূপ প্রত্যহ আমার ছেলে খাইতে বসিলে কিছুই পাইবে না। যা কিছু ভাল মন্দ জিনিস হবে, বেশীর ভাগ দিদী আপনার ছেলেদের পাতে ঢালিয়া দিবেন—বাছা আমার মুখখানি চূণ করিয়া আধপেটা খাইয়া উঠিয়া যায়। কোন দিন আস্ত রুইমাছটা আসলে, মুড়াটা আগে দিদীর বড় ছেলের পাতে পড়িবে,—আমার ছেলে হয়ত একখানি দাগা, নয়ত একটু মাছের কোণ ভাঙ্গা পাইবে। ঘরে দুধ হয়, বেশীর ভাগ ওঁর ছেলেরা খাবে। আমার ছেলে কি বাণের জলে ভেসে এসেছে? দেখ দেখি একবার চেয়ে, ছেলেটার না খেয়ে খেয়ে কি রকম চেহারা হয়েছে? ও রকম কল্লে ক দিন বাঁচবে?"

ক্রমশঃ।

স্বর্গীয়া ভারত-মাতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

বিগত ৯ই মাঘ (২২এ জানুয়ারি) মঙ্গলবার সায়ংকালে সুবিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী ভারত-সাম্রাজ্ঞী মহা-মহিমাময়ী দেবী ভিক্টোরিয়া ইহলোক হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়াছেন। সুগভীর শোক সাগর উথলিয়া সমগ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছে। রাজা প্রজা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই হাহাকারে গগন মেদিনী প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এরূপ বিশ্বপ্লাবী শোকোচ্ছ্বাস আর

কখনও কাহারও বিয়োগে হইয়াছে বোধ হয় না। ৮১ বৎসর যিনি এই পৃথিবীতে ধন ঐশ্বর্য্য ও যশো-গৌরবে পরিবেষ্টিত হইয়া জীবিত ছিলেন এবং ৬৩ বৎসর কাল শান্তি ও মহা গৌরবের সহিত সূর্য্যাস্তহীন মহারাজ্যের উপর রাজত্ব করিয়াছেন, প্রায় সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী তাঁহার জীবনের সহিত অনুস্যূত এবং এই শতাব্দীর প্রায় সমুদায় মহৎ ঘটনা তাঁহার রাজত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই যুগ "ভিক্টোরিয়া যুগ" এবং ভিক্টোরিয়া চরিত্র "আদর্শ চরিত্র" বলিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই। বিংশ শতাব্দী অভ্যুদিত হইয়া এত শীঘ্রই উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বাপেক্ষা অমূল্য ও পূর্ণোজ্জ্বল কীর্ত্তিমুকুটকে ভূগর্ভসাৎ করিল, ইহার অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি আর কি করিবে?

বিক্টোরিয়া-চরিত্রে আমরা কি দেখিতে পাই? জ্ঞান, প্রেম, নৈতিক বল ও ধর্ম্মজীবনের একত্র সম্মিলন। মহারাণী নিজে সুশিক্ষিতা ও বিদ্যানুরাগিণী ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বে আপামর সাধারণের মধ্যে যেরূপ জ্ঞান বিস্তার করিয়াছেন আর কস্মিন্‌কালে সেরূপ হয় নাই। তাঁহার হৃদয় প্রেমপূর্ণ হৃদয় ছিল। শৈশবে পিতৃহীন হইয়াও স্বর্গগত পিতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তিনি সিংহাসনস্থ হইলেও জননীকে দেবীর ন্যায় ভক্তি ও সেবা করিতেন। সখীগণের প্রতি তাঁহার চির-সৌহৃদ্য। স্বামীর প্রতি এরূপ পূর্ণানুরাগ পতিব্রতা হিন্দু রমণীদেরও অনুকরণীয়। তাঁহার সন্তান-বাৎসল্য অসাধারণ। এত বড় উচ্চপদস্থ হইয়া দাস দাসী ও পৌরজনের প্রতি এত ভালবাসা অতি অল্প লোকেই দেখাইতে পারিয়াছেন। তাঁহার প্রেম যথার্থই গৃহে আরব্ধ হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। মহারাণী নিজে যেমন ন্যায়নিষ্ঠা ও নির্ম্মল-চরিত্রা ছিলেন, তাঁহার চরিত্র-প্রভাবে তাঁহার সংসৃষ্ট সকলকেই সেইরূপ করিতে সচেষ্ট ছিলেন এবং অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার সময়ের সহিত পূর্ব্ব সময়ের তুলনা করিলে ইংলণ্ডের কি রাজসভা কি সমাজ-ক্ষেত্র কি নর-নারীর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবন— এ সকলেই স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রভেদ লক্ষিত হয়। তাঁহার ঈশ্বরভক্তি, পরকালে বিশ্বাস ও ধর্ম্মানুগত জীবন বাল্যকাল হইতে অন্তিম-সময় পর্য্যন্ত সুদৃঢ়, অটল ও উজ্জ্বল ছিল এবং তিনি জাতি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলের ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমাদর প্রদর্শন করিয়া আপনার উদার ধর্ম্মভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

এই সকল গুণের উপর মহারাণী যেমন রাজরাজেশ্বরীর পদ লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আদর্শ রাজগুণের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সারল্য, নিরহঙ্কার, সৌজন্য, সহৃদয়তা ও প্রজারঞ্জন-পরতা, সুদীর্ঘকাল রাজকার্য্যে নিরালস্য ও উৎসাহপরতা এবং সাম দান, ভেদ সন্ধি দ্বারা রাজ্য সংরক্ষণ ও বিস্তার সকলই আশ্চর্য্য। ১৮৫৮ সালে ভারত সাম্রাজ্য-

ভার নিজ হস্তে গ্রহণকালে তিনি যে ঘোষণা পত্র প্রচার করেন, তাহা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে তাঁহার রাজহৃদয়ের ছবি জগৎ-সমক্ষে জাজ্জল্যমানরূপে ধারণ করিবে এবং তাঁহার প্রদর্শিত রাজনীতি পৃথিবীর সকল রাজার শিক্ষণীয় হইয়া চিরদিন থাকিবে। ইংলণ্ডের নিয়মতন্ত্রের মধ্যে রাজশক্তি স্বতন্ত্ররূপে কার্য্য করিতে সমর্থ নয়, এই জন্য মহারাণীকে অনেক সময় আপনার রুচি, ভাব ও ইচ্ছাকে খর্ব্ব করিয়া চলিতে হইয়াছে—এজন্য যে দোষ হইয়াছে, তাহার জন্য মন্ত্রিসভা, লর্ড ও কমন্স সভা এবং ইংলণ্ডের জন সাধারণ দায়ী। কিন্তু রাজ-শক্তি দ্বারা শাসনবিভাগের যতদূর দোষ ও অনিষ্টকারিতা নিবারণ করিতে পারা যায়, মহারাণী তাহা করিয়াছেন।

মহারাণী বিক্টোরিয়া একাধারে সকল মহদ্গুণের আধার ছিলেন—তিনি আদর্শ কন্যা, আদর্শ পত্নী, আদর্শ মাতা, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ দীনবৎসলা ও বিশ্বহিতৈষিণী এবং আদর্শ সাম্রাজ্ঞী ছিলেন। সর্ব্বোপরি তিনি আদর্শরমণীর শিরোমণি ছিলেন। তাঁহাকে হারাইয়া জগৎ যাহা হারাইয়াছে, তাহা কি আর ফিরিয়া পাইবে?

মহারাণীর রাজত্বের যুগ কেন স্মরণীয় মহাযুগ? ৬৪ বৎসর কালব্যাপী দীর্ঘ-রাজত্ব ঐতিহাসিক যুগে কয়জন রাজা রাজ্ঞীর ভাগ্যে ঘটিয়াছে? রৌপ্য জুবিলী অধিকাংশ রাজেশ্বরের ভাগ্যে ঘটে না, মহারাণীর স্বর্ণ ও হীরক জুবিলীর উৎসব হইল, ইহার উপরে পৃথিবীর অতীত স্বর্গের উৎসব ভিন্ন আর কি মহোৎসব আছে? তাহাই তিনি ভোগ করিতেছেন। এই রাজত্ব যেমন দীর্ঘ, তেমনি অসীম সমৃদ্ধি ও গৌরবপূর্ণ। ইংলণ্ডের জাতীয় মহিমা এই সময়েই ষোলকলায় পূর্ণচন্দ্র আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। জাতীয় ইতিহাস মহাজন সকল লইয়া সংগঠিত। ইংলণ্ডেতিহাসের এক এক বিভাগ যে মহাজনদিগের প্রতিভায় উজ্জ্বল হইয়াছে, আমরা তাঁহাদিগের কয়েকটীর নাম মাত্র উল্লেখ করিতেছি; ইহাতেই বিক্টোরিয়া রাজত্বের মহিমার আভাস পাওয়া যাইবে।

(১) রাজনীতিক্ষেত্র—ওয়েলিংটন, গ্লাডষ্টোন, ডিসরেলী, ক্যানিঙ, কবডেন, ব্রাইট, পামারষ্টোন।

(২) কাব্যে—সাউদে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন, ব্রাউনিং।

(৩) ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে—গ্রোট, মিল, মেকলে, গ্রীন্ কার্লাইল, ফ্রুড।

(৪) ঔপন্যাসিক—থ্যাকারে, ডিকেন্স, জর্জ ইলিয়ড।

(৫) বৈজ্ঞানিক—হক্সলী, টিণ্ডাল, ডারউইন।

(৬) দার্শনিক ও চিন্তাশীল লেখক—বেইন, হার্বার্ট স্পেন্সার, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, মার্টিনো, রস্কিন, স্মাইলস।

(৭) ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ—মেইন, বেন্থাম।

(৮) শিল্পী—ষ্টিভেন্সন আর্করাইট।

(৯) ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ—কার্ডিনাল ও ফ্রান্সিস্ নিউ-ম্যান, ম্যানিঙ, স্পার্জিয়ন, কুমারী কব।

(১০) বিশ্ব-সেবাব্রতী—মেরী সমারভিল, কুমারী নাইটিঙ্গেল, কুমারী কার্পেণ্টার।

এই রাজত্বে ইংলণ্ডে বাষ্পীয় পোত, লৌহ-বর্ত্ম (রেলরোড), টেলিগ্রাফ, ফনোগ্রাফ, বাষ্পীয় ও তাড়িতালোক, সমুদ্র নিম্নে তার,

পেনী পোষ্ট ও অন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী প্রভৃতি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে।

মহারাণী ১৮টী মন্ত্রিসভার উৎপত্তি ও লয় দেখিয়াছেন। তাঁহার সাম্রাজ্যে কেনেডা বিদ্রোহ হইতে আরম্ভ করিয়া ট্রান্সভাল সমর পর্য্যন্ত ৪৪টী যুদ্ধ হইয়াছে, সকলেতেই প্রায় ইংরাজপক্ষের জয় হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে ইংরাজ বাহুবল ও রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে।

মহারাণীর রাজত্বে ভারতের নূতন মহা যুগের পত্তন হইয়াছে। ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়, স্ত্রীশিক্ষা, মুদ্রাযন্ত্র বিস্তার, ডাক, টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে, বাষ্পীয়যান, গ্যাস ও বিদ্যুৎ আলোক, শিল্প বাণিজ্যের মহোন্নতি এবং নানা উপায়ে জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রচার বিক্‌টোরিয়া যুগেরই মহাকীর্ত্তি। রাজা রামমোহন রায় হইতে মহাদেব রাণাডে পর্য্যন্ত এ যুগের ভারতের মহাপুরুষ সকলেই বিক্‌টোরিয়ার সম-সাময়িক। আর নব্য ভারতের গৌরবনিদান ব্রাহ্মসমাজ, জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় মহাসভা অন্তর্জ্জাতিক শতবিধ সম্মিলন ও উন্নতি চেষ্টা বিক্‌টোরিয়া রাজত্বেরই শুভফল।

বিক্‌টোরিয়া যুগ কেবল ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের উন্নতির পরিচায়ক নহে, সমগ্র পৃথিবীর মহাপরিবর্ত্তন ও মহোন্নতির সাক্ষী। জগতের সমগ্র ইতিহাস সমালোচনা করা বৃহৎ ব্যাপার! আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি বিক্‌টোরিয়া যুগ—(১) মহামিলনের যুগ, (২) স্বাধীনতার যুগ, (৩) বৈজ্ঞানিক যুগ, (৪) শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারের যুগ, (৫) শিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রচারের যুগ। এই যুগে ইংলণ্ডের অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সকল মিলিত হইয়া যেমন মহারাজ্যে পরিণত হইয়াছে, জার্ম্মাণি প্রভৃতিও এক এক প্রবল সাম্রাজ্য আকারে গঠিত হইয়াছে। এই যুগে ইটালী, ব্রেজিল ও তুরুকাধীন কোন কোন রাজ্য স্বাধীন হইয়াছে এবং বোয়ারদিগের স্বাধীনতার যুদ্ধ চলিতেছে। এই যুগে আমেরিকা ও ইউরোপে জড়বিজ্ঞানের অসীম উন্নতি হইয়াছে এবং 'বিজ্ঞানের অসাধ্য কিছুই নাই', লোকের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়াছে। এই যুগে পৃথিবীর পূর্ব্বপশ্চিম উত্তরদক্ষিণ সকল অঞ্চলের লোক এক বাণিজ্য সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে এবং পরস্পরের শিল্পজাত ও মূল্যবান্ দ্রব্যজাত পরস্পরের সহিত বিনিময় করিতেছে। এই যুগে শিক্ষা কেবল সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ নহে, কিন্তু আপামর সাধারণ সকলের জন্য ইহার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে এবং পুরুষের সহিত স্ত্রীজাতি সমান অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আর ধর্ম্ম ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বরের ন্যায় উদার ও অসাম্প্রদায়িক আকার ধারণ করিয়া ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, সাধু পাপী সকলের নিকট পরিত্রাণের সুসমাচার প্রচার করিতেছে—চিকাগোতে পৃথিবীস্থ ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকলের মহাসম্মিলন বিক্‌টোরিয়া যুগেই সম্ভবপর হইয়াছে। যদি "কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি" হয়, মহারাণী তাঁহার মহাযুগের মহাকীর্ত্তিতে জীবিত; আর ঐহিক অসার কীর্ত্তির অতীত আত্মার জ্ঞান, প্রেম ও

পবিত্রতা বিভূষিত অক্ষয় অমর জীবন যদি সত্য হয়, তিনি অমররাজ্যে অমরগণের মধ্যে সেই মহাগৌরবান্বিত জীবনে জীবিত।

আমাদের মহারাণী।

আমাদের মহারাণী কোথায়?—বল, বল, ইংলণ্ড! একবার বল; আমরা দীন দরিদ্র ভারতবাসী, আজি আমাদের খ্যাতি নাই, কীর্ত্তি নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, প্রভুত্ব নাই, আজি আমাদের কিছুই নাই, আজি আমরা পথের ভিখারী ভিখারিণী, এই ভিখারীদিগের সর্ব্বস্ব ধন আমাদের মহারাণী!—আমাদের আরাধ্য দেবী, স্নেহময়ী মা, সুখে উৎসব, দুঃখে ভরসা, আমাদের সেই সর্ব্বস্ব ধন—আমাদের সেই মহারাণী, তিনি কোথায়? বল! বল! ইংরাজের টেলিগ্রাম! ইংরাজের কামান! একবার বল, একবার অভ্রভেদী নিনাদে বল, ভারত উদ্‌গ্রীব হইয়া পথ চাহিয়া আছে, তোমরা একবার বল! উহু! বুক যে ফাটিয়া যায়! ওমা ভারত-জননি! আর কি শুনিবি মা, কেমন করিয়া শুনিবি মা, ওমা! তোর যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তোর দুরদৃষ্টের শেষ সৌভাগ্য-রেখা যে মুছিয়া গিয়াছে, ওমা! তোর রাজ-সিংহাসন শূন্য করিয়া, তোর মত কাঙ্গালিনীকে অনাথা করিয়া, কোটি কোটি সন্তানকে মাতৃহীন করিয়া তোর রাজ-রাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া আমাদের মহারাণী আজি স্বর্গে যাইতেছেন! যাঁহার স্নেহে, যাঁহার দয়ায়, যাঁহার পালনে তুমি তোমার সেই আর্য্য-রাজত্বের কথা, অতীত গৌরবের কথা, সেই স্বপ্নময় সুখের কথা ভুলিয়াছিলে, সেই দয়াময়ী স্নেহময়ী সম্রাজ্ঞীরত্ন, আমাদের সেই মহারাণী আজি স্বর্গে যাইতেছেন। আর তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার কোমলপ্রাণে ব্যথা লাগিবে না, আর তোমার মঙ্গলার্থে তিনি মহাসভাকে সাধিবেন না, আর তোমাকে আদর করিয়া তোমার গৌরব বাড়াইবেন না!—ওমা! আমাদের মহারাণীর মত মহারাণী কে পাইয়া থাকে? সে নারীরত্ন বৃটিশ রাজ্যে জন্মিয়াছিলেন, তাই সে রাজ্যের কত গৌরব! তাঁহাকে সন্তান পাইয়া মাতা-পিতার কত গৌরব! তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী পাইয়া স্বামীর কত গৌরব। তাঁহাকে জননী পাইয়া সন্তানগণের কত গৌরব! তাঁহাকে মহারাণী পাইয়া ইংরেজের কত গৌরব! তাঁহাকে দয়াময়ী পাইয়া দীন-দুঃখীর কত গৌরব! তাঁহাকে প্রতি-যোগিনী পাইয়া বিপক্ষের কত গৌরব। তাঁহাকে স্বজাতীয়া রমণী-রত্ন পাইয়া রমণীকুলের কত গৌরব!—আর হত-ভাগিনী তুমি—তাঁহাকে রাজ-রাজেশ্বরী পাইয়া তোমারও কত গৌরব! তাই

বলিতেছি মা, আমাদের মহারাণীকে হারাইয়া লোকে বাঁচে কি করিয়া? সহিয়া থাকে কি করিয়া?

তা তুমি সহিতে পারিবে মা; এ রকম অসহনীয় অনির্ব্বচনীয় শোক যাতনার মহোষধ রোদন। চাহিয়া দেখ মা, আজি তোমার বক্ষে সাদা কালো প্রভেদ নাই, হিন্দু মুসলমান বিচার নাই, পুরুষ রমণীর পার্থক্য নাই, সকলেই প্রাণ খুলিয়া মা, ভিক্টোরিয়ার জন্য, আমাদের মহারাণীর জন্য, মাতৃহীন শিশুর মত কাঁদিয়া আকুল হইতেছে!—রাজ-শাসন ভয় নাই, সম্মান বা প্রতিপত্তির আশঙ্কা নাই, কোন রকম স্বার্থপরতার ছায়া নাই, কেবল প্রাণের উচ্ছ্বাসে কোটি কোটি মানব আকুল হইয়া কাঁদিতেছে। চাহিয়া দেখ মা, সেই স্নেহময়ী, করুণাময়ী, সতী, পুণ্যবতী, রাজগুণালঙ্কৃতা সাম্রাজ্ঞীকে হারাইয়া, দলাদলি ভুলিয়া, ভাই ভাই গলাগলি হইয়া কাঁদিতেছে। বুঝি আমাদের মহারাণীর করুণার স্রোত—পুণ্যের স্রোত কোটি কোটি চক্ষে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। এমন দারুণ শোকের দিনে—এমন পুণ্যময় দৃশ্য কে কবে দেখিয়াছে? তুমি যে আজ ধন্য হইলে মা! আজ এই রাজ-ভক্তি গঙ্গায় স্নান করিয়া ধন্যা হইলে, পবিত্রা হইলে, কৃতার্থা হইলে! তাই বলিতেছি, ভরসা হইতেছে, এই বুক-ভাঙা শোকও তুমি সহিতে পারিবে মা।

মানুষ মরিবার জন্যই তো জন্মিয়া থাকে; কিন্তু দেহের ধ্বংসে সকলেই মরে না। যাহার খ্যাতি নাই, কালের বক্ষে যাহার জীবিত কালের কোনও আনন্দের চিহ্ন নাই আর যাহাকে ভালবাসিবার কেহ নাই, সে জীবন্তেও মৃত। আর যাহার খ্যাতি আছে, কাল যাহার শুভ জীবনকাল "সুকীর্ত্তি" বলিয়া বক্ষে ধরিয়া আছে, আর যাহাকে ভালবাসিবার হৃদয় আছে; সে মরিয়াও অমর। এই হিসাবে রাজা দুর্য্যোধন মরিয়াছেন; তৈমুর লঙ মরিয়াছেন; পঞ্চদশ লুই মরিয়াছেন; কিন্তু হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র, আকবর মরেন নাই। আজি বিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাজাসন ছাড়িয়া কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়াসনে বিরাজ করিতেছেন! কাল তাঁহার অমর কীর্ত্তি অমৃতময় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিতেছে! আজি মা, মহারাণী তাঁহার অবসন্ন দেহ মরজগতে রাখিয়া অমরধামে গমন করিতেছেন! সে মেয়ে মরিবার মেয়ে নহে!

তবে মা! দীন দয়াময়ি! প্রজাবৎসলে! আমাদের মহারাণি! আমাদের ভারতেশ্বরি! অস্তাচলগামী সূর্য্যের মত, তুমি জীবনের ব্রত সমাপ্ত করিয়া আজি স্বর্গে চলিলে মা? সত্য সত্যই পৃথিবী আজি তোমার মত অমূল্য রত্নে বঞ্চিতা হইল? সত্য সত্যই নর-মানবগণ তোমার বিয়োগ শোকে আচ্ছন্ন হইল? সত্য সত্যই তোমার সাধের ভারতের মাথায় বজ্রাঘাত হইল? তুমি সত্য সত্যই স্বর্গে চলিলে মা? আর কি বলিব; যাও মা! যাও;

বাঙ্গালি হিন্দু যেমন করিয়া পূজিতা প্রতিমা বিসর্জ্জন করে, আমরা তেমনি বুকে পাষাণ চাপিয়া বলিতেছি, যাও মা! যাও—আমাদের স্নেহময়ি! করুণাময়ি! রাজ-রাজেশ্বরি! তোমার উপযুক্ত স্থানে অমর লোকে যাও। যেথানে রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মরণ নাই, তুমি সেইথানে যাও। তুমি আদর্শ রমণী, আদর্শ সাম্রাজ্ঞী, নরজগতে দেবী, সংসারে আনন্দময়ী, রাজ্যে সৌভাগ্য-প্রতিমা, ভারতে সর্ব্বমঙ্গলা, বিধাতার মানসী কন্যা, যেথানে তোমার যোগ্য স্থান, তুমি সেই-থানে যাও। যেথানে সুখ অনন্ত, শান্তি অনন্ত, আনন্দ অনন্ত, তুমি সেই রাজ্যে যাও। যেথানে "কোহিনুর" ধূলি কণার মত, সূর্য্যাস্তশূন্য সাম্রাজ্য জলবিম্বের মত, এ নর জগতের সকল সৌভাগ্যই শিশুর খেলার মত, সেই মহৈশ্বর্য্যময় দেশে যাও। যেথানে তোমার উপাস্য দেবতা তোমার পতিরত্ন তোমার অপেক্ষায় রহিয়াছেন, সেই চিরবাঞ্ছিত দেশে যাও। আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও মা, যেন তোমাতে আমাদের ভক্তি থাকে, যেন তোমার মত দেবীকে প্রাণের প্রাণে পূজা করিয়া আমরা কৃতার্থ হই।

তবে এস একবার শোকার্ত্ত ভারতবাসী! আমাদের মহারাণী স্বর্গে যাইতেছেন, তোমরা যে যেথানে আছ একবার প্রাণ ভরিয়া "হরি হরি" বল। একবার কোটি কোটি গলা একত্র মিশাইয়া, স্বর্গমর্ত্ত্য প্রতি-ধ্বনিত করিয়া, হিমাচল হইতে কুমারিকা বিকম্পিত করিয়া হরি! হরি! বল! যমের হস্ত হইতে যমদণ্ড খসিয়া পড়িবে, বিঘ্ন বিপদ দূরে পলাইবে, হৃদয়ে উদ্যম, বল, শান্তি আসিবে, একবার সাধ মিটাইয়া হরি! হরি! বল। লেখিকা—শ্রীমা—

শোক-গাথা।

ভারতসম্রাজ্ঞী আলেকজ্যান্দ্রিণা ভিক্টোরিয়া মাতার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত।

(জন্ম—১৮১৯, ২৪শে মে; মৃত্যু—১৯০১, ২২শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার সন্ধ্যা৬৷৹ ঘটিকা।

১

অভাগী ভারত! আজি শুনিলি কি করি—
শূন্য রাজ-সিংহাসন
কোটি কোটি প্রাণ মন,
স্বরগে চলিলা তোর রাজ-রাজেশ্বরী!
ছুটিছে শোকাগ্নি শিখা,
হিমাচল কুমারিকা,
ছুটিছে সিন্ধুর বক্ষে আগ্নেয় লহরী!
এত জ্বালা অভাগিনি! সহিছ কি করি!

২

এ জ্বালা বিষম জ্বালা, নহে সহিবার—
যে দেবীরে পেয়ে "রাণী"
ভুলেছিলে অভাগিনি!
পোড়া কপালের ব্যথা পরাধীনতার!
যাঁর প্রজা-বৎসলতা
স্মরায় অতীত কথা
হিন্দুর রাজত্বে—সেই গৌরব তোমার,
তোর সেই মহারাণী আজ নাই আর!

৩

সত্য কি গো! অস্তগামী তপনের বেশে,
সমাপি কর্ত্তব্য যত,
সাধি জীবনের ব্রত,
গেলে মা ভারতেশ্বরি! দেবতার দেশে?
ঊষা যে আবার হবে,
তুমি মা আসিবে কবে?
রবি যে আসিবে কালি নিশা অবশেষে,
তুমি কি গো আসিবেনা দয়াময়ী-বেশে?

৪

পুণ্যময়ী স্নেহময়ী করুণার খনি!
তোমার তুলনা দিতে,
কি আছে মা! পৃথিবীতে,
মানসে গড়িলা বিধি তোমারে আপনি!
দেবের বাঞ্ছিত মেয়ে,
শুভক্ষণে কোলে পেয়ে,
শিহরি উঠিল মরি আনন্দে অবনী!
বাসন্তী কুসুম-রূপ
অপরূপ অপরূপ!
পবিত্র হইল ছুঁয়ে জনক জননী!
তোমারি মিলনে সতি!
কৃতার্থ হইল পতি,
মণি-কাঞ্চনের যোগ হেরিল ধরণী!
দয়া, মায়া, সুদক্ষতা,
বিদ্যা, বুদ্ধি, পবিত্রতা,
সকলি লভিলে তুমি নারীকুল-মণি!
শত পুণ্যে ছেলে মেয়ে,
মাতৃরূপে তোমা পেয়ে,
জীবনের সার্থকতা লভিল জননি!
পরিজন, দাস দাসী,
জ্ঞাতি বন্ধু, প্রতিবাসী
সবে জানে দেবী সংসার-পালনী,
ধন্য ধন্য মহারাণি নারী-কুলমণি!

৫

তব রাজ্যে দিনকর অস্ত নাহি যায়,
শত্রু মিত্র সমভাবে তব যশ গায়;
তোমারি মহত্ত্বে সতি!
সসাগরা বসুমতী,
তোমার চরণ-ছায়ে ঘুমাইতে চায়—
কোটি কোটি প্রজাগণে,
সন্তান জানিয়া মনে,
পালিয়াছ ন্যায় সহ স্নেহ করুণায়!
ও হৃদি অমৃত-সিন্ধু,
মানে নি খ্রীষ্টান হিন্দু,
চাঁদের আলোক কোথা ছোট বড় চায়!
এমনি উদার প্রীতি
বিপক্ষের যশোগীতি,
গাহিয়াছ প্রাণ খুলি ভুলি আপনার
অনাথ-অধম দুখে,
কত ব্যথা লাগে বুকে,
স্বরগ বাতাস যথা সবারে জুড়ায়।
কি আছে ভাষার শক্তি
ক্ষুদ্র বুকে কই ভক্তি,

বর্ণিতে তোমার গুণ ক্ষমতা কোথায় ?
যতনে "আদর্শ" বিধি গড়িলা তোমায়।

*

আজি মা ! ভারত তব কার মুখ চায় ?
হায় সে সাম্রাজ্ঞী-রত্ন,
কে করে সাধনা যত্ন,
তুমি যে করুণাময়ী নাহি এ ধরায়।
ভীষণ কামান শব্দ,
জগত হতেছে স্তব্ধ,
শত বজ্র পড়িতেছে ভারত হিয়ায়।
বিশ্ব যেন কালি-মাখা,
সকলি আঁধারে ঢাকা,
শোকভরা ধরাখানি, কি দেখিনু হায় !
লেখনী খসিয়া পড়ে,
নয়ন আপনি ঝরে,
আগুন লেগেছে যেন হৃদি-কন্দরায়,
আজি মা ! ভারত তব কার মুখ চায় ?
তবে,
পুণ্যময় জীবনের লীলা পরিহরি,
যাও মা স্বরগ-ধামে ভারত-ঈশ্বরী !
যাও দেবতার দেশে
রাজ-রাজেন্দ্রাণী-বেশে,
পাতিয়াছে রত্নাসন অমর অমরী ;
গাঁথিয়া মন্দার-মালা,
ডাকে তোমা দেব-বালা,
গাহিছে ও গুণ-গাথা কিন্নর কিন্নরী।
তুচ্ছ মণি কোহিনুরে
ফেলিয়া মরতপুরে,
পরগে ত্রিদিব-রত্ন মহানন্দ করি।
তোমারি লাগিয়া সতি !
তব প্রিয়তম পতি
পুত্র পৌত্র সনে আছে প্রতীক্ষায় মরি !
সাঙ্গ জীবনের কার্য্য;
যাও যথা দেব-রাজ্য,
যাও ভবিষ্যৎ-ভূপে আশীর্ব্বাদ করি।
আমরা মরম-স্তরে
পূজিব মা চির তরে
দয়াময়ী ভিক্টোরিয়া ভারত-ঈশ্বরী !
জীবন হইল ধন্য,
হইনু কৃতার্থমন্য,
তোমারে পাইয়ে রাণী তব গুণ স্মরি !
কোটি কণ্ঠ মিশাইয়া,
স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপাইয়া,
ডাকরে ভারতবাসী ! ডাক হরি হরি !
স্বর্গে চলে যায় মাতা রাজ-রাজেশ্বরী !

শ্রীমা———সাগরদাঁড়ী।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ের ঔষধ—বঁইচ গাছের শিকড় এবং গোটাকতক মরিচ একত্রে বাটিয়া খাইলে সদ্যসদ্যই আমাশয় আরোগ্য হয়। এই গাছের রং দুই প্রকার, শ্বেত ও লোহিত ; শ্বেত গাছের শিকড়ে সাদা আমাশয়, আর লাল গাছের শিকড়ে রক্তআমাশয় আরোগ্য হইবে। খাওয়াইবার নিয়ম—শিশুদের ৭টা গোলমরিচ দিয়া, যুবাদের ১১টা ও বৃদ্ধদের ২১টা মরিচ সংযোগে খাওয়াইবে।

২। কুইনাইনের অপব্যবহারের ঔষধ—একটা পাতিলেবুকে গোবর মাখাইয়া পোড়াইয়া লইবে, পরে ভাত খাইবার প্রথমে সেই লেবু ধুইয়া তাহার রস খাইবে, ইহাতে কুইনাইনের দোষ সমূহ—যথা মাথার যাতনা প্রভৃতি থাকিবে না।

৩। অম্বল ও অম্লশূল রোগের মহৌষধ—গেঁড়িপোড়া চুণ এক আনা, মহাদ্রাবক চারিআনা, সজিনা শিকড়ের রসে মিশ্রিত করিয়া খাইলে অম্ল বা অম্লশূল আরোগ্য হয়। প্রথমতঃ সজিনা শিকড়ের রসে গেঁড়িপোড়া চূণ দিয়া একদিন রাখিবে, পরে তাহাতে মহাদ্রাবক দিবে। চারি আনা আন্দাজ মোড়ক করিয়া একদিন খাইবে, আর এই ঔষধ খাইবে না। ঔষধ খাইবার পরেই তেঁতুল গোলা জল খাইবে, তৎপরে জল খাইবে। কেবল তেঁতুল গোলা জল ৭ দিন ভাত খাইবার পরে খাইয়া জল খাইবে; ইহার ভিতরে উক্ত অসুখ দুই এক দিন বৃদ্ধি রাখিবে, তাহাতে কেবল তেঁতুল গোলা জল অধিক পরিমাণে খাইবে। এইরূপ করিলে একেবারে রোগটি নির্দ্দোষ হইবে।

৪। চক্ষুতে ছানি পড়ার ঔষধ—বোতলচূর্ণ ১ তোলা, মুড়া মাখন ১ তোলা, খাঁটি মধু ১ তোলা, একটা লবঙ্গ ও একটা পাতি লেবুর রস। প্রথমতঃ বোতল চূর্ণকে খুব মিহি করিয়া (ময়দার মত) ছাঁকিয়া লইবে। পরে পাতিলেবুর রস, মুড়া মাখন ও খাঁটি মধুতে লবঙ্গ ঘসিয়া লইয়া সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া ফোটাইবে; পরে দুই প্রহরের রৌদ্রাতপে দিবে এবং মধ্যে মধ্যে এক একবার ফোটাইবে, এইরূপে তিন দিবস রৌদ্রে দিবে ও ফোটাইবে, পরে একটা কাচপাত্রে রাখিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিবে, ইহাতে চক্ষুর ছানি কাটিয়া গিয়া ভাল হইয়া যাইবে।

৫। নিউমোনিয়ার ঔষধ—আমরুলের স্বত্ব (রস) খাইলে উপকার হইবে, (ইহা শিশুদের ১ কাঁচ্চা; বড়লোকদের এক ছটাক হইতে দেড় ছটাক পর্য্যন্ত খাইতে দিবে)। একটা কাচের বা পাথরের বাটিতে গোঁড়া লেবুর রসে চিতি (খেঁচি) কড়ি দিন রাত ভিজাইয়া পরে সোহাগার খৈ দিবে। একটি খলে এই উভয় দ্রব্য বেশ করিয়া গুঁড়াইবে (মিশ্রিত করিবে)। তদন্তে ছেলেদের ১ রতি আর বৃদ্ধদের ১ হইতে ২ রতি পর্য্যন্ত খাইতে দিবে।

৬। নিউমোনিয়ার মালিস—একটা পিতল বাটীতে খাঁটি সরিষার তৈল লইবে, তাহাতে আমরুলের পাতা দিবে, পরে মৃদু উত্তাপে এই উভয় দ্রব্য খুব ভাজিবে, চুঁইয়া গেলে পরে নাবাইবে; এবং সেই তৈল বুকে মালিস করিলে উপকার হইবে।

৭। অবধৌতিক মতে সালসা—সর্পকা (বননীল); চিরতা, আলীহরীতকী; সরতারা (ক্ষেত পাপড়া); মনেক্কা; মিছরী; অনন্তমূল; সোণামুখী; বসরাই গোলাপ (বড় গোলাপ); এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকটী ১ এক ভরি করিয়া লইয়া ৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে, পরে ৮ তিন

পোয়া থাকিতে নামাইবে ; ইহাতে এক বোতল সালসা প্রস্তুত হইবে। ইহা সেবন করিলে দেহ পুষ্টি ও রক্ত পরিষ্কার করে।

নূতন সংবাদ।

১। মহারাণীর দেহাবসানে যুবরাজ আলবার্ট ৭ম এডওয়ার্ড নামে বৃটিষ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর এবং ভারতের সম্রাট্ হইয়াছেন। তিনি মাতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবেন, ঘোষণা করিয়াছেন। নূতন রাজা ও রাণী ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে দীর্ঘজীবী হইয়া রাজধর্ম্ম পালনে সমর্থ হউন্।

২। আলবার্ট বিক্টর হাসপাতালের জন্য দান ;—

কুমার রাধাপ্রসাদ রায়	২৫০০০৲
ব্যারিষ্টার আর মিত্র	৭৫০০৲
বাবু রাধারমণ রায়	২৫০০৲
রায় পশুপতিনাথ বসু	২৫০০৲

৩। বলরামপুরের মহারাজা রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দরিদ্রদিগের জন্য একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৪। হিমালয়ের ছেনূলীর বুদ্ধগুহা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ১৩০০০ ফিট উচ্চ, এখানে ২১ জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আছেন। ইহার উর্দ্ধে আর মানবের বাস দেখা যায় না।

৫। আবার ভূমিকম্প—আসামের কোনও কোনও স্থানে ২।৩ মিনিট ছিল, ময়মনসিংহ ও মুরসিদাবাদেও অগ্রসর হইয়াছে।

৬। ঢাকার নবাব সহরে বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবহার জন্য ৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৭। রেবরেণ্ড জি জে ম্যানলী ১৮৯৩ সালের প্রথম রাঙ্গলার, অসাধারণ গণিতজ্ঞ। তিনি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ ভারতে আসিয়াছেন।

৮। নব সিবিলিয়ান্ বালকরাম কলিকাতা ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ; কেম্‌ব্রিজ গণিত ট্রাইপোতে ৫ম স্থানীয় রাঙ্গলার হইয়া স্বদেশে ফিরিয়াছেন।

৯। বিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দিরের জন্য কলিকাতার টাউনহলে মহাসভা হইয়া ফণ্ড হইতেছে, ইহাতে কাশ্মীরের রাজা ১৫, সিন্ধিয়া মহারাজ ১০ লক্ষ, জয়পুরের মহারাজ ৫ লক্ষ এবং আর কয়েকটী বড়লোক যে টাকা দিয়াছেন, তাহাতে ইতিমধ্যে ৩৭ লক্ষ টাকা হইয়াছে।

১০। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভা হয়। রাজপ্রতিনিধি এবং নূতন বাইস চ্যান্সেলর রালে সাহেব সুন্দর বক্তৃতা করেন।

১১। ইংলণ্ডের রাজ্ঞীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

১২। নূতন রাজা ও রাজ্ঞী পার্লামেণ্ট মহাসভা খুলিয়াছেন। রাজ-বক্তৃতায় ভারতের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। হো এণ্ড কোর পকেট ডায়ারী। মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত। ১৯০১ সালের এই সুন্দর ডায়ারীখানি প্রাপ্ত হইয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ইহার ছাপা বাঁধা প্রভৃতি যেমন সুন্দর, ইহাতে তেমনি পঞ্জিকা ও অন্যান্য সকল আবশ্যক বিবরণ আছে এবং দৈনিক নোট লিখিবার যথেষ্ট স্থান আছে। ছয় আনা মূল্যের এরূপ পুস্তক সুলভ।

২। ওলাউঠা চিকিৎসার ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতা—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দত্ত এম ডি প্রণীত, মূল্য ১৸০ টাকা। গ্রন্থকর্ত্তার পিতাও প্রাচীন হোমিওপাথী ডাক্তার। পিতা ও পুত্র উভয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এই পুস্তকে সম্মিলিত হইয়া ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছে। পুস্তক খানিতে ওলাউঠার নিদান লক্ষণ, চিকিৎসা প্রভৃতি সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইহা সম্ভব হইলে প্রত্যেক গৃহে রাখিবার যোগ্য।

৩। নারীধর্ম্ম—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী (মুস্তফী) প্রণীত মূল্য ॥০ আনা। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা কাব্যরচনায় পারদর্শিতা হেতু একটী সাহিত্য সভা হইতে "সরস্বতী" উপাধি এবং তাঁহার পতিভক্তি ও চরিত্রগুণে আর এক সভা হইতে "সাবিত্রী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা সামান্য গৌরব ও আনন্দের বিষয় নয়। বর্ত্তমান পুস্তকখানি রচনা করিয়া তিনি তাঁহার লিপি নৈপুণ্যের সহিত শাস্ত্রজ্ঞান, সুযুক্তিপরতা ও ধর্ম্ম-প্রাণতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে স্ত্রীলোকের কি শারীরিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক, কি সাংসারিক সকল বিষয়ের উন্নতিকল্পে সমীচীন উপদেশ আছে। সন্তানপালন ও গৃহচিকিৎসা সম্বন্ধেও অনেক সঙ্কেত আছে। লেখিকার কোনও কোনও মতের সহিত আমরা একমত হইতে না পারিলেও আমরা তাঁহার বিচক্ষণতা ও হৃদয়ের সদ্ভাবে মুগ্ধ হইয়াছি। এই পুস্তক প্রত্যেক হিন্দু নারীর পাঠ্য। ইহাতে হিন্দুনারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা কিছু শিক্ষণীয় সকলি আছে।

৪। বুদ্বুদ শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী প্রণীত। সরল বিশুদ্ধ সুন্দর কতকগুলি ভাব হৃদয় হইতে সময় সময় উত্থিত হইয়া কবিতাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এ গুলি জল-বুদ্বুদের ন্যায় শূন্য বুদ্বুদ নয়। ইহাতে সৌন্দর্য্য আছে, মিষ্ট রস আছে, এবং ভিতরে সারত্বেরও পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক উৎসাহ লাভের জন্য চেষ্টা করিলে সুকবি হইতে পারিবেন।

বামারচনা।

স্বর্গগতা মহারাণী।

হায়রে ব্রিটেনেশ্বরী ভারত-জননী,
পুণ্যবতী গুণবতী দেবী মহারাণী,
ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ার গৌরবের স্থল,
শরদিন্দুসম কান্তি শুভ্র সুবিমল।
অর্দ্ধেক পৃথিবী যুড়ি যাঁর রাজ্যভার,
করিল কঠিন কাল পতন তাঁহার!
হায়রে ব্রিটেনেশ্বরী ভারত-জননি!
গুণবতী পুণ্যবতী দেবী মহারাণি।
রুস ফ্রান্স আমেরিকা তব ভয়ে ভীত,
তুমিও মা মৃত্যু মুখে হইলে পতিত?
হায়রে কি সুকঠোর কালের নিয়ম,
অচ্ছেদ্য অভেদ্য তাহা বিষম দুর্গম।
সমস্ত পৃথিবী কাঁপে যাঁর ভুজবলে,
সেও আজি হীনবল কালের কবলে!!
রে মৃত্যু! জানিনু আমি এত দিন পরে
তব সম বলবান্ নাহি এ সংসারে।
সকলের প্রভু তুমি সকলের রাজা,
স্তবে তুষ্ট নাহি হও, নাহি লও পূজা।
সদ্যোজাত শিশু হতে নবীন প্রবীণ,
রাজা হতে মহারাজা দীন হতে দীন;
কাহারো ত তব কাছে নাহিক নিস্তার,
তুমি মৃত্যু পার কর ভব পারাবার।
বিষম বার্দ্ধক্য জ্বালা সংসার যন্ত্রণা
তব কাছে গেলে মৃত্যু! কিছুই থাকে না।
সসাগরা ধরা সদা যাঁর ভয়ে কাঁপে,
জাপান জর্ম্মণি ভীত যাঁহার প্রতাপে,
তেজঃপুঞ্জ ভৃত্য খাটে যাঁহার পারশে,
সেও আজি ম্লান জ্যোতিঃ মৃত্যুর পরশে।

কোথা মা ইংলণ্ডেশ্বরী ভারত-জননী,
দয়াময়ী, গুণময়ী দেবী মহারাণী।
জননী ধরিত্রী তুমি ভুবন-বিজয়া,
কেন না করিলে দূর মরণের ছায়া?
কেন মা বসুধা গর্ভে করিলে শয়ন,
শূন্য করি আপনার রাজ-সিংহাসন?
হায়রে বুয়ার যুদ্ধ! তোর চিন্তা করি,
বুঝি আজ গতপ্রাণ রাজরাজেশ্বরী!
মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বর্গের প্রতিমা,
প্রজার দুর্গতি-হরা দেশের গরিমা—
ভারত আদরে ছিল মায়ের সোহাগে,
কাঁদিবে এখন হৃদে শোকচিহ্ন এঁকে।
কি কুক্ষণে এসেছিলি জানুয়ারী মাস!
মহারাণী হরিয়া করিলি সর্ব্বনাশ।
বাইশে মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময়
মহারাণী গিয়াছেন অমৃত-আলয়।
দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা নিষ্ঠা পরার্থ-পরতা,
জ্ঞানের উজ্জ্বল সূত্রে ছিল প্রাণ গাঁথা।
মধুতে মাখান তব বদনের কথা,
শ্রুতমাত্র তাপিতের দূর হয় ব্যথা।
ছিলে তুমি প্রজাদের প্রাণের সমান,
পরহিতে সমর্পণ করেছিলে প্রাণ।
পুণ্যবতী মহারাণী নিজ পুণ্যবলে,
গেলেন সংসার হতে নিরুদ্বেগে চলে।
যাও মা আনন্দধামে আনন্দদায়িনী,
আদরে নিবেন কোলে আনন্দরূপিণী।
অনন্ত পাইবে শান্তি—অনন্ত মঙ্গল,
পুত্র-শোকানল নিভে হইবে শীতল।

নিদারুণ পুত্রশোকে এই বৃদ্ধকালে
মরিয়াছ মা আমার জ্বলে জ্বলে জ্বলে।
বিতরি প্রসাদ বারি সেই পুত্রশোকে,
যাও মাতা সুখে, ধাতা লইছেন ডেকে।
স্বর্গাদপি গরীয়সী তুমি সবাকার,
যেখানে সেখানে থাক লহ নমস্কার।

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস।

বসন্ত পঞ্চমী।

এস এস বীণাপাণি!
এসগো হৃদয়-রাণি!
ভকত জনের!
মরমের ভাল বাসা,
জীবনের সাধ আশা
পূর ভকতের!
বাঙ্গালীরা দীন হীন,
রোগে শোকে তনুক্ষীণ,
তবু আশা মনে,—
জননী আসিয়া ঘরে,
আদর সোহাগ ভরে,
স্নেহের চুম্বনে—
সন্তানে লবেন কোলে,
শোক তাপ যাবে চলে,
মায় পরশনে।
তাই আশা পথ চেয়ে,
রহিয়াছে ছেলে মেয়ে,—
জননী তোমার!
মলয় মধুর হেসে,
কহিতেছে কাণে এসে
শুভ সমাচার!
ভ্রমর মধুর গায়,
সুধা ঢালি পাপিয়ায়,—
কহিছে সঘনে!
"আসিছেন বীণাপাণি,
পূজিতে সে পা দুখানি
পরম যতনে,
কর আয়োজন তত,
যাহার ক্ষমতা যত,
পরম হরষে।"
আনন্দে মাতিয়া তাই,
সবে করে ধাওয়া ধাই।
একটি বরষে
পাইয়াছে যে বেদনা—
পাইয়াছে যে যাতনা
মরম ভিতর,—
মায়ে দিয়া ফুল সাজ,
সে সব ভুলিবে আজ;
লহরে লহর
বহিবে সুখের ঢেউ
রহিবে না বাকি কেউ,
আর তাই সোন!
গাহিয়া আনন্দ-গীতি
অর্ঘ্য দিয়া প্রেম প্রীতি
জুড়াব জীবন।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী (মুস্তোফী)।

সূর্য্যমুখীর প্রতি কুন্দ।

আমি একজন ভিখারী,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে তোমারি,
ওগো কৃপা নয়নে হেরি,
বাঁচাও গো দীন বলিয়ে॥
ওগো কোমল দয়ার মূরতি,
তুমি পূর্ণ স্নেহ মমতা প্রীতি,
তাই এসেছি আজ অকৃতী,
একবার চাহগো আঁখি তুলিয়া।
তুমি সুন্দর উষার বরণী
তুমি বিশ্ব প্রেমের প্রবিনী,
অয়ি নির্ম্মল চিত্তশালিনী,
আমি এসেছি তোমারি লাগিয়ে।
আমি দূর প্রান্তবাসিনী,
আমি তব স্নেহ-ভিখারিণী,
তাই চাহি দিবস যামিনী,
বিতর করুণা করিয়ে।
ঐ শ্যামল যমুনা বহিয়ে,
সুখ কল্লোল গাইছে,
পবন হিল্লোলে দুলিছে
শুভ্র স্বচ্ছ প্রেম ঢালিয়ে,
কত ভূধর উদর ব্যাপিয়ে,
কত সৈকত পুলিন ভাসায়ে,
কত সুখ দুখবার্ত্তা গাইয়ে,
যমুনে যায়গো বহিয়ে;
ঐ নীলিম কক্ষ মাঝারে
বহিছে প্রেম নিঝরে
সেত দিতেছে তৃষিত জনারে
কাতর মুখ চাহিয়ে।
তব হৃদয় সরসী-সলিলে
হের ফুটেছে শতদলে দলে
সৌরভ আকুল হুকুলে
তাই এসেছি আমি ছুটিয়ে।
আমি শুনেছি স্বর্ণ-বরণী,
তব ভাণ্ডারে মাণিক্যখনি,
তুমি পরম ধনের ধনী
আজি এসেছি ভিখারী সাজিয়ে।
দেও শূন্য হৃদয় পূরিয়ে,
দেও শুষ্ক পরাণ ভিজায়ে,
দেও ব্যথিত জীবন জুড়ায়ে,
আপনা পর ভুলিয়ে।
এই তাপিত বক্ষ সজল আঁখি,
এই, আঁধার হৃদয় অনন্ত-ব্যাপী,
যেন তমসা বিহীন রাতি
রেখেছে হৃদয় ঢাকিয়ে॥
তুমি ঢালগো অমৃত ধারা—
যেন হিমানী শীতল-পারা,
এ যে জীবন-তৃষাতুরা,
যাউক আজি জুড়ায়ে।

শ্রীনি—দেবী।

আগমনী।

১

এস মাগো শ্বেতভুজে, বাণী বীণাপাণি
শ্বেত পদ্মাসনা দেবি, আনন্দরূপিণী।
আপনি প্রকৃতি রাণী,
পূজিতে ও পা দুখানি,
সাজায়েছে সুমোহন সাজেতে ধরণী,
এস অয়ি শ্বেতভুজে! কমল বাসিনী।

২

পিককুল হৃষ্টমনে করে হুলুধ্বনি,
বিহঙ্গমগণ গাহে তব আগমনী।
নির্ম্মল আকাশ থালে,
কনক প্রদীপ জ্বেলে,
আপনি শশাঙ্ক তোমা করিছে আরতি।
সুষুপ্ত ভারতে আজ এস মা ভারতি!

৩

নানাবিধ ফুলকুল ফুটিয়া উঠানে,
দিতেছে অঞ্জলি তব যুগল চরণে।
অলি গুণ গুণ স্বরে,
তব গুণ গান করে।
মলয় সমীর করে চামর ব্যজন,
আজি যে ভারতে তব শুভ আগমন।

৪

দারুণ দুর্ভিক্ষে, রোগে, ভীষণ বন্যায়
তোমার সন্তানগণ আছে মৃতপ্রায়,
গৃহে কারো অন্ন নাই,
শরীরে সামর্থ্য নাই,
তোমারে পূজিতে নাহি কোন উপাচার,
কি দিয়ে পূজিবে মাগো চরণ তোমার!

৫

যদিও সন্তানগণ তব দীন হীন,
তথাপিও তারা তব ভক্ত চিরদিন।
যার যা শকতি আছে,
এনেছে তোমার কাছে,
পূজিতে তোমায় মাগো ও রাঙ্গা চরণ;
দীনদের পূজা দেবী করগো গ্রহণ।

৬

বালক বালিকাগণ পুলক অন্তরে,
রাতুল চরণ তব পূজিবার তরে,
প্রাতে উঠি ফুল্ল মনে,
তুলি ফুল সযতনে,
ফুল বিল্বপত্র লয়ে সাজাইয়া ডালি,
ভক্তিভরে তব পদে দিতেছে অঞ্জলি।

৭

ভক্তের বাসনা দেবী করগো পূরণ,
সন্তানগণেরে দেহ আশীষ বচন।
হে ভারতি, তব ঠাঁই,
আমি এই ভিক্ষা চাই,
যেন গো জননী তব পুত্র কন্যাগণ,
তোমার সেবায় রত থাকে আজীবন।

শ্রীমতী নী—

** বামাবোধিনী ফণ্ড হইতে স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মরণার্থ রচনা-পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। আগামী সংখ্যায় তাহার বিশেষ বিবরণ জ্ঞাপন করা যাইবে। বা, বো, স।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৮ বর্ষ। ৪৩৫ সংখ্যা। | চৈত্র, ১৩০৭; এপ্রেল, ১৯০১। | ৭ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্বর্গীয়া মহারাণীর স্মৃতিরক্ষা (১) ইহার জন্য গবর্ণর জেনারেল লর্ড কুর্জনের প্রস্তাব এই যে "বিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল" কলিকাতায় হইবে। তাহার ফণ্ডে ইতিমধ্যে ৩৬ লক্ষ টাকার সংস্থান হইয়াছে।

(২) কলিকাতাস্থ দেশীয় হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান ও মুসলমান মহিলাদিগের এক সভা হয়, নাটোরের মহারাণী সভাপতিত্ব করেন। তাহাতে স্থির হয়, ভারতের সকল শ্রেণীর মহিলাদের চাঁদায় একটী স্বতন্ত্র ফণ্ড হইয়া মহারাণীর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইবে।

(৩) বিলাতে সাধারণের চাঁদায় মহারাণীর একটী প্রতিমূর্ত্তি হইবে, ইহা রাজা ৭ম এডওয়ার্ডের অনুমোদিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন নানা দেশ প্রদেশ ও নগরাদির রাজভক্ত লোকে মহারাণীর নামে কূপ, পুষ্করিণী, বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ওলন্দাজ রাজ্ঞী—রাজ্ঞী উইলহেলমিনা মেক্‌লিনবর্গ-সোয়ারিকার ভূস্বামী ডিউক হেনরীর সহিত যে বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইয়াছেন, তাহার বিধি কিছু স্বতন্ত্র। রাজ্ঞী স্ত্রীভাবে স্বামীর সম্পূর্ণ অধীন, কিন্তু রাজ্যেশ্বরী-ভাবে অধীন হইবেন না। স্বামী তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি সকলের উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিবেন, কিন্তু ভূসম্পত্তি দান বিক্রয়াদি করিতে পারিবেন না। তিনি যাবজ্জীবন রাজ্ঞীর প্রদত্ত ৫ কোটি (গিল্‌ডার্স) টাকার সুদ ভোগ করিবেন, রাজ্য হইতে কোনও বৃত্তি পাইবেন না। এই যুবতী রাজ্ঞী আমাদের স্বর্গীয়া

মহারাণীর ন্যায় বহুগুণশালিনী, তিনি নিজে মাদক স্পর্শ করেন না এবং মাদক ও দুর্নীতি নিবারণের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। জগদীশ্বর ইঁহাকে সর্ব্ব বিষয়ে আদর্শ রাজ্ঞী করিয়া দেশের ও জগতের মঙ্গল সাধনের সহায় করুন্।

মারিয়া বাঁচান—সে কালের মুনি-ঋষিরা অভিসম্পাতে কাহাকেও মারিয়া বরদানে আবার বাঁচাইতেন এইরূপ প্রবাদ। চিকাগোর বৈজ্ঞানিক সেনিজার তাড়িতাঘাতে এক বিড়ালকে মারিয়া ২ ঘণ্টা পরে আবার তাড়িতযোগে তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন। টেলুসা নামক আর এক বৈজ্ঞানিক এইরূপ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহা হইলে বজ্রাঘাতে মৃত ব্যক্তি তাড়িত প্রয়োগে বাঁচিতে পারে।

জর্ম্মণির প্রজা বৃদ্ধি—এ বৎসরের গণনানুসারে জর্ম্মণির অধিবাসীর সংখ্যা ৫ কোটি ৬৩ লক্ষের অধিক। ৫ বৎসরে ৪০ লক্ষ বাড়িয়াছে।

অশ্বারোহিণী প্রহরিণী—রাজবধূ ইয়র্কের ডচেস ইংলণ্ডের রাজবংশধর ইয়র্কের ডিউকের সহিত অষ্ট্রেলিয়া দর্শনে গমন করিলে তত্রত্য সহস্র মহিলা তাঁহার অশ্বারোহিণী শরীর-রক্ষিকা হইবেন।

সোণার হার—আশাবাহিনীর ন্যায় (golden chain) সোণার হার নামে বালক বালিকাদের এক সভা আমেরিকায় আছে, তাহার সভ্যগণের প্রতিজ্ঞা :—"সর্ব্বজীবে দয়া করিব। দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব। পবিত্র কথা মনে করিব ও মুখে বলিব এবং পবিত্র ও উত্তম কার্য্য করিব। স্বর্গ মর্ত্ত্যে আমার কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ পালন করিব।"

প্রত্যেক সভ্যের ইহা প্রাতঃস্মরণীয়।

বোয়ার সমর—বোয়ারদিগের কেপ কলোনী আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে, তথাপি তাহারা যুদ্ধে ক্ষান্ত নয়।

চিন-সন্ধি—চিন গবর্ণমেণ্ট শক্তিপুঞ্জের প্রস্তাব সকল অনুমোদন করিয়া সন্ধি-বদ্ধ হইয়াছেন। চিনে কিন্তু বিদ্রোহ ও গোলযোগের শান্তি নাই। অনেকে খৃষ্টীয় মিসনারীদিগকে এই অশান্তির জন্য দায়ী বলিতেছেন।

অন্ধজন সংখ্যা—পৃথিবীর অধিবাসী ১৫০ কোটি লোকের মধ্যে ১০ লক্ষ অন্ধ।

মান্দ্রাজ শিক্ষিতা রমণী—মান্দ্রাজ প্রেসীডেন্সী কলেজের দর্শনাধ্যাপক সামুয়েল সাথিয়ানাধানের পত্নী স্থানীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্ব প্রথম 'এম এ' হইয়াছেন।

সাম্রাজ্ঞী ভিকটোরীয়ার শেষ দুই কথা—(১) আলবার্ট, আলবার্ট, আলবার্ট! (২) "হায়! শান্তি আসুক।" স্বামীর স্মৃতি এবং বৃদ্ধ যুদ্ধ শান্তির ইচ্ছা মহারাণীর প্রাণকে কি প্রবলরূপে অধিকার করিয়াছিল!"

বিংশ শতাব্দীর আয়োজন—ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় কেহ লক্ষ, কেহ ৫ লক্ষ, কেহ ১০ লক্ষ টাকা প্রচার-কার্য্যার্থ সংগ্রহের সঙ্কল্প করিয়া ইতিমধ্যেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ধর্ম্ম প্রচারে টাকার

অপেক্ষা ধর্ম্মসাধনার আয়োজন অধিক আবশ্যক।

বনলতা স্মৃতি—কন্তঃপুরের প্রবর্ত্তিকা স্বর্গীয়া বনলতা দেবীর স্মরণার্থ কয়েকজন নরনারী একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও দুইটী রচনা-পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এ সংবাদে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনচরিত।

(জন্ম ২৪এ মে ১৮১৯, মৃত্যু ২২এ জানুয়ারি ১৯০১)।

এই নূতন শতাব্দীতে, নূতন বর্ষের প্রথমে সকলে কত না আশায়, কত না আনন্দে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর সহিত সকল বিঘ্ন—সকল বিপদ দূর হইবে সকলেই আশা করিতেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে লোকে কিনা কষ্ট পাইয়াছে? দারিদ্র্যে, দুর্ভিক্ষে, অনশনে কত সহস্র লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। জলপ্লাবনে ও অতিবৃষ্টিতে, কত লোক বিনষ্ট হইয়াছে। দুর্দ্দমনীয় প্লেগে ও ম্যালেরিয়ায় কত শত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভীষণ যুদ্ধে কত সহস্র লোক অকালে প্রাণ হারাইয়াছে। চীনে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া সোণার রাজ্য ছারখার করিয়াছে। সকলেই আশা করিয়া ভাবিয়াছিলেন, এই বিংশ শতাব্দীর আগমনের সহিত সমস্ত জগতে শান্তি সংস্থাপিত হইবে। অমঙ্গল বিপদরাশির সহিত উনবিংশ শতাব্দীকে বিদায় দিয়া তাই অনেকেই অমর কবি টেনিসনের গাথা গাহিয়াছিলেন।*

"আন নবীনে বরণ করি, বিদায় করি পুরাতনে
হরষ আনন্দধ্বনি ভেসে যাক্ সারা ভুবনে,
বরষ যেতেছে চলে, যাক্ চলে, যেতে দাও তায়,
অসত্যে বিদায় করি, ধ্রুব সত্যে জাগাও হিয়ায়।"

এই বর্ষের প্রারম্ভে কোথায় শান্তি সংস্থাপিত হইবে, তাহা না হইয়া সেই শান্তিরূপিণী, করুণাময়ী, মূর্ত্তিমতী প্রীতিস্বরূপা, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সহসা তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য অন্ধকার করিয়া সিংহাসন শূন্য করিয়া, স্নেহের পুত্র কন্যা ও আত্মীয় স্বজনের মমতা ভুলিয়া, সমগ্র

* "Ring out the old, Ring in the new,
Ring happy bells across the Snow
The year is going, let him go
Ring out the false, and ring in the true."
(In Memoriam.)

সম্পদ, ঐশ্বর্য্য অধিকার ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন? দয়াময় জগদীশ্বর জীবনে তাঁহাকে যেরূপ শান্তি দিয়াছিলেন, তাঁহার এই মৃত্যুতেও তাঁহাকে সেই শান্তি দিয়া আপনার শান্তিময় ক্রোড়ে টানিয়া লউন এই প্রার্থনা। যুগে যুগে, কল্পে কল্পে কি আর কেহ এইরূপ সহৃদয় পরোপকার-ব্রত-ধারিণী ধার্ম্মিকা রাজ্ঞীর রাজ্যে বাস করিয়াছিল? তাঁহার শোকে সমগ্র ইংলণ্ড অভিভূত, আজি বঙ্গেও কি সে শোকের তরঙ্গ আসিয়া প্রতি মানবের হৃদয়ে আঘাত করে নাই? সেই আদর্শ সাম্রাজ্ঞী, আদর্শ রমণী, আদর্শ সহধর্ম্মিণী ও আদর্শ জননীর জীবনচরিত লিখিবার বাসনা আমি পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমাদের ভারতে আদর্শ সতী রমণীর জীবন বৃত্তান্ত যেরূপ পুণ্যময়, এই ইংরাজ রমণী ও সমগ্র ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের অধিকারিণী মহারাণীর জীবন বৃত্তান্তও সেইরূপ পুণ্যময়। রাজকবি টেনিসন বলিয়াছেন :—

"Her court was pure, her life serene;
God gave her peace, her land reposed,
A thousand claims to reverence closed
In her as Mother, Wife, and Queen;

শান্তি স্বরূপিণী, তাঁর রাজসভা পবিত্রতাময়,
রাজ্য তাঁর শান্তিপূর্ণ, হৃদি শান্তির নিলয়।
আদর্শ জননী, জায়া, রাজ্ঞী ধরাপরে,
সহস্র কারণে পূজনীয়া চিরতরে।

বাল্যজীবন।

বিরাশী বৎসর পূর্ব্বে, পুরাতন কেনসিংটন প্রাসাদে একটি বালিকার জন্ম হয়। তখন তাঁহার কথা কেহই জানিত না। ভিক্‌টোরিয়া এলাক্‌জ্যানড্রিনা (Victoria Alexandrina) ১৮১৯ সালে ২৪শে মে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ডিউক অফ কেণ্ট ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জের চতুর্থ পুত্র ছিলেন। তাঁহার জননী প্রিন্সেস লেনিংজেন বিক্‌টোরিয়া স্যাক্সকোবর্গের প্রিন্স ও বেলজিয়মের রাজা প্রিন্স লিওপোলডের ভগিনী ছিলেন। অবশ্য রাজ-পরিবারের সকলেই এই ক্ষুদ্র বালিকার আগমনে আনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ তৃতীয় জর্জ আপনার নামানুসারে এই বালিকার নাম জর্জিয়ানা রাখিতে চাহিলেন এবং তাঁহার পিতা ইংলণ্ডের প্রিয় নাম এলিজাবেথ রাখিতে ব্যস্ত হইলেন। প্রিন্স রিজেণ্ট রুষিয়ার সম্রাটের নামে এলেকজ্যানড্রিনা নাম রাখিলেন। তাঁহার জননীর নামে তাঁহার নাম ভিক্‌টোরিয়াও হইল। বাল্যকালে সকলেই তাঁহাকে এলেকজ্যানড্রিনার পরিবর্ত্তে 'ড্রিনা' বলিয়া ডাকিত।

রাজ-পরিবারের মধ্যে ড্রিনাই সর্ব্ব প্রথমে টীকা দেওয়া হয়। টীকা দিবার পর তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে ডিভনের তীরে সইড মাউথে লইয়া যান। সেই স্থানে তিনি একদা আশ্চর্য্যরূপে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। ধাত্রী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রীড়াগারে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় গবাক্ষের মধ্য দিয়া সহসা এক

বন্দুকের গুলি আসিয়া তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল। একটী শিকারানভিজ্ঞ যুবক, পক্ষি-শিকার করিতে গিয়া, অসাবধানতা বশতঃ বন্দুকের লক্ষ্য স্থির রাখিতে না পারায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। সে সময় বৃষ্টি পড়িতেছিল। ডিউক পদব্রজে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, সহসা পথে বৃষ্টি পড়ায় আর্দ্র বসনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

গৃহে আসিবামাত্র এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন না করিয়াই শিশু কন্যাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া তাঁহার ক্রীড়াগারে গেলেন। ড্রিনা তখন ৮ মাসের শিশু। পিতাকে দেখিয়াই সে আনন্দ ধ্বনি করিতে করিতে, পিতার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতে গেল এবং উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। ডিউক তথায় কয়েক মিনিট মাত্র ছিলেন, সেই কয়েক মিনিটই তাঁহার জীবন নাশের কারণ হইল। আর্দ্রবসন পরিত্যাগ করিতে বিলম্ব হওয়ায়, অতিশয় ঠাণ্ডা লাগিয়া বুকে সর্দ্দি বসিয়া গেল এবং তাহাতেই ড্রিনা অতি শৈশবে পিতৃহীন এবং তাঁহার জননী বিধবা হইলেন।।

ডচেস অফ কেণ্ট বিধবা হইবার পর সেই কেনসিংটন প্রাসাদে নির্জ্জন-বাসেই থাকিতেন। ইংলণ্ডে তাঁহার পরিচিত অতি অল্প লোক ছিল। কিন্তু তাঁহার স্বামী যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন সর্ব্বদাই বালিকার ভাবী শিক্ষার বিষয়ে কথোপকথন হইত। তিনি তাই স্বর্গীয় স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী প্রণালীতে বালিকাকে শৈশব হইতেই শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। যাহাতে ড্রিনার হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালে সুফল উৎপন্ন হয়, সে বিষয়েও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ডিউক অফ কেণ্ট অতিশয় পরোপকারী, সর্ব্বজন-প্রিয়, সহৃদয় পুরুষ ছিলেন। পিতার হৃদয়ের সকল সদ্‌গুণগুলিই ড্রিনার জীবনে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ডচেস অফ কেণ্ট রাজপ্রাসাদের ব্যসন বা বাহিরের আমোদ প্রমোদ আদবে পছন্দ করিতেন না। নির্জ্জনে আপনার প্রথমা কন্যা (প্রথম স্বামী প্রিন্স লেনিংজেনের ঔরসজাত) থিওডোরোকে ও ড্রিনাকে লইয়া থাকিতেন।

তৎকালে রাজবাটীতে বালিকাদিগের জন্য, কোনও ভিন্ন আহারীয় বা আহারের স্থান নির্দ্ধারিত ছিল না। প্রভাতে ৮ ঘটিকার সময় মাতার প্রাতর্ভোজনের সহিত তাঁহাদিগকে দুধ রুটি ও ফল দেওয়া হইত। গ্রীষ্মকালে বৃক্ষচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন প্রান্তরে, প্রাতর্ভোজন করিতে করিতে তাঁহারা সুরভিত কুসুমের সুবাস আঘ্রাণ ও বিহঙ্গকূজন শ্রবণ করিতেন। জীবনের প্রভাতে তিনি এই প্রকার সরল গ্রাম্য-জীবন কাটাইতে শিখিতেছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার জন্য শিক্ষয়িত্রী (Governess) রাখা হইল। তখন তিনি সেই শিক্ষয়িত্রীর সহিত কখনও পদব্রজে কখনও শকটারোহণে ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তিনি সামান্য রমণীর মতই

জীবনের প্রারম্ভভাগ কাটাইয়াছিলেন। রাজকীয় প্রাসাদে বাস বা সাম্রাজ্ঞীর মত থাকিবার বাসনা কখনও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই।

প্রথমে অন্য কেহই ডচেস্ অফ কেণ্ট বা তাঁহার ক্ষুদ্র কন্যার কথা মনে আনিত না। তাঁহারা সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী স্থান সমূহে বাস করিতে ভাল বাসিতেন। তন্মধ্যে রাম্‌সগেট ও বোর্ডষ্টেরার উল্লেখযোগ্য। তবে যখন চতুর্থ জর্জের মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতা চতুর্থ উইলিয়ম রাজা হইলেন, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই রাজ-পরিবারের ভাবী উত্তরাধিকারী সকলেই একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিলেন, তখন সকলেই মনে মনে স্থির জানিলেন এই বালিকাই কালে ইংলণ্ডের রাণী হইবেন। সেই সময় ভিক্টোরিয়া ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া বালিকা মাত্র। তবুও সেই সময় হইতে তিনি অসামান্যা রূপলাবণ্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। তিনি অতিশয় দীর্ঘাঙ্গী ছিলেন না; অথচ এমন সুশ্রী ছিলেন যে তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী শ্রী বলিলেও অত্যুক্তি হইত না, তাঁহার সেই তুষার শুভ্র বর্ণে কে যেন গোলাপী আভা তুলিতে ফুটাইয়াছিল এবং সেই উজ্জ্বল আয়ত নীল নয়ন দুটিতে যেন সরলতা ও পবিত্রতা সর্ব্বদা বিরাজ করিত। সেই সময় একদা তাঁহাকে এক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন "আপনিই ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের মহিমাময়ী রাণী হইবেন।" বালিকা এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় গম্ভীর ভাবে, স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া উত্তর করিলেন, "ইংলণ্ডের রাণী হইলে সম্মান অধিক বটে, কিন্তু তদপেক্ষা দায়িত্ব গুরুতর।" *

তার পর যখন ডাঃ ডেভি রাজকুমারীর শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলেন, তখন আর তাঁহার মুহূর্ত্তের জন্য অবসর থাকিত না। মাতৃভাষার উপর ফরাসী, জর্ম্মান ও ইটালীয় ভাষা শিখিতে হইত। তদ্ভিন্ন সকল প্রকার সুকুমার কলা বিদ্যায় পারদর্শিনী হইবার জন্য সঙ্গীত ও বাদ্য শিখিতে হইয়াছিল, এবং তাহার সঙ্গে চিত্রবিদ্যা ও কারুকার্য্য শিখিতেছিলেন। ডাঃ ডেভি কেবল মাত্র এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষরূপে শিক্ষা দিতেন, এবং সেই সুকুমার বালিকা-হৃদয়েই আত্মত্যাগ ও চিত্ত-সংযম ব্রত লইতে অভ্যস্ত করাইয়াছিলেন। সেই বালিকা অন্যের আত্মত্যাগ ও চিত্ত সংযমেও যে মুগ্ধ হইতেন, তাহার একটি উদাহরণ এই—

ভিক্টোরিয়া তাঁহার শিক্ষয়িত্রী ও ভগিনীর সহিত সর্ব্বদাই দোকানে গিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে ভাল বাসিতেন। একদা তাঁহারা তিনজনে এক স্বর্ণকারের অলঙ্কারের দোকানে গিয়া দেখিলেন দোকানদার একজন রমণীকে কয়েক গাছি স্বর্ণ হার দেখাইতেছে। রমণী তন্মধ্যে এক গাছা মনোনীত করিয়া দর জিজ্ঞাসা করিবার পর, অতি নিরাশা-

* If the honour is great, the responsibility is greater.

বাজক আননে সেটীকে ফিরাইয়া অন্য একটি অল্প মূল্যের হার চাহিলেন। দোকানদার কারণ জিজ্ঞাসা করায় রমণী কহিলেন "আমার নিকট অত অর্থ নাই, আমি ধারে লইব না।" দোকানদার একটি অল্প মূল্যের চেন দিবার পর তিনি ম্লানমুখে ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। ভিক্টোরিয়া রমণীর চিত্ত-সংযম দেখিয়া একান্ত প্রীত হইয়াছিলেন। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ রমণী কি তোমার পরিচিতা? তিনি কোথায় থাকেন?" দোকানদার বিনীত-ভাবে কহিল "রাজকুমারী! আমি উহাঁকে বিলক্ষণ জানি, সর্ব্বদাই আমার দোকানে দ্রব্যাদি ক্রয় করেন।" তখন রাজকুমারী কহিলেন "আচ্ছা, ঐ হার ছড়াটি তাঁহার আলয়ে পাঠাইয়া দাও এবং বলিয়া দিও তাঁহার চিত্ত-সংযমের শক্তিতে প্রীত হইয়া রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া এই সামান্য উপহার পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

তাঁহার সুকুমার হৃদয়ে উদারতা ও সহৃদয়তা কিরূপ ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল এই সামান্য ঘটনাতেই তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়।

যখন তিনি সপ্তদশ বর্ষীয়া, তখন তাঁহার মাতুল স্যাক্সকোবর্গ গোথার অধিপতি প্রিন্স লিওপোল্ড তাঁহার দুই পুত্র প্রিন্স আরনেষ্ট (Prince Ernest) ও প্রিন্স আল্‌বার্টকে (Prince Albert) লইয়া, আপনার ভগিনী ডচেস অফ কেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কেনসিংটন প্রাসাদে আসিলেন। সেই সময়েই রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া আপনার হৃদয় প্রিন্স আল্‌বার্টকে চিরদিনের মত সঁপিয়া দিলেন।* প্রথম দর্শনেই উভয়ে উভয়কে প্রাণ মন সঁপিয়া ভালবাসিয়াছিলেন।

আমাদের ভারতবর্ষেও এ প্রকার স্বয়ম্বরায় কথা বিরল নহে। সাবিত্রী সত্যবানকে দেখিয়া মনে মনে বরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, স্বামীর মৃত্যু হইবে জানিয়াও সেই সত্যবান্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও বিবাহ করেন নাই।

তাঁহারা দুইজনে সেই সময় একত্রে লণ্ডনের নানা দৃশ্য দেখিয়া বেড়াইতেন, এবং উভয়ে উভয়ের নিকট সুপরিচিত হইতেছিলেন। উভয়ের প্রাণের কথা আর উভয়ের নিকট গোপন রহিল না। প্রিন্স আল্‌বার্ট রাজকুমারীকে হৃদয় মন সঁপিয়া ভালবাসিলেও, কখনও সে ভালবাসা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করেন নাই। তিনি আপনাকে রাজকুমারীর অনুপযুক্ত জানিয়া বোধ হয় মনে মনে বলিতেন :—

"দূরে রও, উর্দ্ধে রও, দেবী হয়ে পূজা লও
পূজিবার দেহ অধিকার"।

তবে প্রণয় কখনও অন্ধ নহে। উভয়ের হৃদয়ের সঙ্গীত একই রাগিণীতে বাজিতেছিল। রাজকুমারী ও প্রিন্স সমবয়স্ক ছিলেন। প্রিন্সের অপেক্ষা রাজকুমারীর বয়ক্রম তিন মাস অধিক ছিল। তাঁহার

* বিলাতে এ প্রকার বিবাহ প্রচলিত, মামাত পিসতত ভাই ভগিনীর মধ্যে বিবাহ চিরকাল হইয়া আসিতেছে।

পর প্রিন্স লিওপোল্ড বালকদ্বয়কে লইয়া জর্ম্মণিতে ফিরিয়া গেলেন। জর্ম্মণিতে ফিরিয়া গেলেও সেই অবধি প্রিনস্ আল্বার্ট ও রাজকুমারীর মধ্যে সর্ব্বদা পত্রালাপ চলিত, এবং উভয়ে উভয়কে সময়ে সময়ে সামান্ত উপহার বা স্মৃতিচিহ্ণও পাঠাইতে ভুলিতেন না।

এই সময় চতুর্থ উইলিয়ম মধ্যে মধ্যে ভি্নাকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। ডচেস অফ্ কেণ্ট ইহা আদৌ পছন্দ করিতেন না। রাজপ্রাসাদে এই সরলচিত্ত, পবিত্র " বালিকাকে পাঠাইতে তিনি সঙ্কুচিত হইতেন। চতুর্থ উইলিয়ম ডচেস অফ কেণ্টের উপর অতিশয় বিরক্ত হইলেও এই লাবণ্যময়ী কিশোরী ভ্রাতুষ্কন্যার প্রতি স্নেহপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার পত্নী রাজ্ঞী আডিলেডও (Adelaide) তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং তিনি সম্রাটকে বলিতেন "ডচেস অফ কেণ্ট ভিক্টোরিয়ার মত সরলা ও পবিত্র-হৃদয়া বালিকাকে রাজপ্রাসাদের দূষিত বায়ু হইতে দূরে রাখিয়া ভালই করিতেছেন।" চতুর্থ উইলিয়মের একান্ত বাসনা যে ভিক্টোরিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে তাঁহার মৃত্যু না হয়; কারণ তাহা হইলে ডচেস অফ কেণ্টের তত্ত্বাবধানে ভি্নাকে থাকিতে হইবে। যাহা হউক তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। ১৮৩৭ সালে ২৪শে মে ভিক্টোরিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। চতুর্থ উইলিয়াম তাহার পরবর্ত্তী মাসের ১৯ শে অবধি বাঁচিয়াছিলেন। *

(ক্রমশঃ)

* মহা মহিমাময়ী সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

দ্রৌপদী।

কবিদিগের কল্পনাশক্তি যতদুর তেজস্বিনী হউক না কেন, তাঁহাদের সেই শক্তি সামাজিক নিয়মের বশবর্ত্তিনী। সুতরাং কাব্যের চরিত্র-রচনায় কবির সমসাময়িক সামাজিক অবস্থানুসারে, কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়ের চরিত্র গঠিত এবং তাৎকালিক রীতি নীতি আচার ও ব্যবহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের চরিত্রে বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যায়। নারী চরিত্রকে চরম আদর্শ করিয়া সম্যক্‌রূপে গঠন করিতে হইলে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, স্নেহপ্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মনিষ্ঠা এই চারিটী উপকরণে নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। প্রাচীন কবি মহর্ষি বাল্মীকি সীতাকে ধর্ম্ম ও স্নেহবৃত্তির মূর্ত্তিময়ী প্রতিমা করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু সীতাকে বুদ্ধিমতী কর্ম্মনিষ্ঠা করিতে তত প্রয়াস পান নাই। ইহার কারণ এইমাত্র অনুমিত

হইতে পারে যে, যে সমাজে সীতা অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, সে সমাজ অতি রূঢ় ও আদিম অবস্থাপন্ন। তখন স্ত্রীদিগের অবস্থা এত উন্নত হয় নাই যে, তাহাদের মন্ত্রিত্ব বা কার্য্যকারিত্বের তত প্রয়োজন হইবে, তখন সমাজ নীতিশৃঙ্খলে বদ্ধ হয় নাই। পতিভক্তি নারীগণের একমাত্র ধর্ম্ম, স্নেহ স্ত্রীগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন ছিল; সেইজন্যই মহর্ষি বাল্মীকি সীতাকে সতীত্ব ধর্ম্ম ও স্নেহের প্রতিমা করিয়া জনসমাজে অর্পণ করিয়াছিলেন।

কাব্যে নারীচরিত্র সমালোচনা করিতে হইলে অগ্রে দেখা উচিত যে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি-চতুষ্টয়ের মধ্যে কয়টী বর্ত্তমান আছে, কারণ এই চতুষ্টয়ের তারতম্যে নারীগণ প্রশংসনীয়া বা নিন্দনীয়া হইয়া থাকেন। প্রাচীন কবিগণ উক্ত বৃত্তির মধ্যে একটি, দুইটি বা তিনটি লইয়া নারীচরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। যে রমণীতে এই চারিটি প্রবৃত্তি উৎকৃষ্টরূপে বর্ত্তমান ও সমঞ্জসীভূত, সেই নারী জগতে নারীগণের পরম আদর্শ। মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা স্নেহের প্রতিমা, 'হলা অণসূএ! ন কেঅলং তাদস্স নিও ও, মমাবি এদেসুং সহোঅর সিণেহো,—(১) বনবৃক্ষ তাঁহার সহোদর, 'জলো বহিনী যে ভোদি তদো কিংত্তিণ সিঞ্চেসি'—(২) বনলতা তাঁহার ভগ্নী—

যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
শ্যামাক মুষ্টিপরিবর্দ্ধিতকো জহাতি
সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে॥ ৩

এবং মৃগশিশু তাঁহার সন্তান।

পাশ্চাত্য কবি সেক্সপীয়রের জুলিয়েট প্রণয়ী রোমিওকে স্বীয় নামটী ছাড়িয়া দিয়া আপনার সর্ব্বস্ব লইতে বলিলেন। বলিলেন—

—Romeo! doff thy name.
And for that name, which is no
part of thee,
Take all myself—

এবং জগতে অতুলন প্রেমময়ী মূর্ত্তি বলিয়া যশস্বিনী হইলেন। অধিকাংশ কবি প্রায় সকলে একই প্রকার ধর্ম্ম-শীলা স্নেহময়ী পতিপরায়ণা রমণীগণের সৃজন করিয়া সমরুচির পরিচয় দিয়াছেন। বাল্মীকির সীতা, শ্রীহর্ষের দময়ন্তী, কালিদাসের শকুন্তলা, সেক্সপীয়রের জুলিয়েট প্রণয় স্রোতে জীবন ভাসাইয়া স্বভাবের গলা ধরিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন, এবং ধরাতলে পতিব্রতা, স্নেহময়ী ও প্রেমের প্রতিমারূপে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রমণীগণের চরিত্রে বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মনিষ্ঠার অভাব মোচন করিতে কবিগণ প্রয়াস পান নাই, সুতরাং আদর্শ নারী-চরিত্র সম্পূর্ণ হয় নাই।

(১) সখি অনসূয়ে। কেবল পিতার আদেশ নহে, ইহাতে আমার সহোদর-স্নেহও আছে।

(২) যখন আমার ভগিনী, তখন কেন না সিঞ্চন করিব?

(৩) কুশবিদ্ধ মুখব্রণ করিতে শোধন
করেছিলে এর মুখে তৈল নিষেচন।
শ্যামতৃণ পরিপুষ্ট কুরঙ্গ-তনয়,
পুত্রভাবে আজ তব পথ আগুলয়।

বেদব্যাস এই অভাব মোচন করিবার জন্য দ্রৌপদী-চরিত্রে ধর্ম্ম, স্নেহ, বুদ্ধি, কর্ম্মনিষ্ঠা এই চারিটী বৃত্তির সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন।

স্বয়ম্বর কালে দ্রৌপদীর মহত্ত্ব ও উন্নত মনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, ক্রমে তাঁহার জীবনীতে উক্ত বৃত্তি চতুষ্টয়ের অধিকতর পরিচয় পাওয়া যায়।

যখন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ-কুমার লক্ষ্য ভেদ করিলেন, তখন মহা কোলাহলে সভা পরিপূর্ণ হইল, কৃষ্ণা পুষ্পহার হস্তে বরমাল্য দানে অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন। দ্রুপদরাজ সমস্ত রাজন্যগণ সম্মুখে ব্রাহ্মণকে কন্যা দান করিবেন এই কথা সকলের মুখে এবং সকলেই ব্রাহ্মণকুমারের প্রতিকুলে সশস্ত্রে ধাবমান। ক্রমে একে একে পরাজিত হইয়া সকলে নিরস্ত হইলেন এবং ব্রাহ্মণকুমারকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন সেই নাতিহ্রস্বা, নাতি-দীর্ঘা, নাতিকৃশা, নাতিস্থূলা লক্ষ্মীস্বরূপা সুদীর্ঘ আকুঞ্চিত সুনীলকেশা পদ্মপলাশ-নেত্রা শরদিইন্দুনিভাননা পঞ্চাল-রাজ-দুহিতা যাজ্ঞসেনী ব্রাহ্মণকুমারের অনুসরণ করিলেন। ক্রমে সকলে কুম্ভকার-ভবনে গমন করিলেন এবং দ্রৌপদী তখন জানিলেন যে যে বীর শালপ্রাংশু মহাভুজ-বলে মহালক্ষ্য ভেদ করিয়া বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তিনি মেঘাবৃত ভাস্করের ন্যায়, ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায়, প্রচ্ছন্ন বেশধারী মহাবীর ধনঞ্জয়, এবং রাজাদিগের সহিত যুদ্ধে বিশালবক্ষঃ মহাবীর কুঞ্জরগতি যিনি অর্জ্জুনের পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি ভীমসেন, এবং সেই সৌম্যমূর্ত্তি ধীর-প্রকৃতি মহাত্মা মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং দুটী কিশোর সুন্দর মনোহররূপ কুমার নকুল ও সহদেব। পরে সেই কুম্ভকার-গৃহে উপস্থিত হইয়া রত্ন-গর্ভা কুন্তীদেবীকে অভিবাদন করিয়া চরিতার্থ হইলেন। কুন্তীর আদেশে পঞ্চ পাণ্ডব তাঁহার স্বামী হইল। প্রথমতঃ ইহা একটী নূতন ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তৎকালীন অবস্থা অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে বহুস্বামিত্ব কেবল দ্রৌপদীর সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা নহে। সপ্ত ঋষি গৌতমকন্যা জটিলার ও দশ প্রচেতা ঋষিকুমারী বার্ক্ষীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বহুপতিত্ব একটী সামাজিক প্রথা ও এই প্রথা বেদব্যাসের সময় সম্যক্ প্রচলিত ছিল ভারতে দৃষ্ট হয়, অথচ বহুপতিত্বের সে সময় সামাজিক প্রয়োজন ছিল কি না, তাহা আমরা বিশেষ বুঝিতে পারি না। ব্যাসদেব কৃষ্ণার পঞ্চ স্বামী যোজনা করিয়া যে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহার মতে পতি দেবতা, পতি সর্ব্বস্ব, পতির অনুগমন সতীর লক্ষণ; শাস্ত্র-বিহিত পতি একই হউক বা বহুই হউক, কায়মনোবাক্যে পতি-অনুসরণ করা পতিব্রতার ধর্ম্ম। পাঞ্চালী পঞ্চ স্বামীর শুশ্রূষা সেবা ও অনুগমন করিয়াছিলেন। তিনি কি সম্পদে, কি বিপদে, কি রাজ-প্রাসাদে কি বনে সকল অবস্থাতেই সকল

স্থানেই পতির দুঃখে দুখী ও পতির সুখে সুখী হইয়া কালাতিপাত করিয়াছেন এবং সখীর ন্যায় স্বামীদিগের সেবা করিয়া পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। অনেক ভারত-রমণী দ্রৌপদীর ন্যায় পতিপরায়ণা ছিলেন। কিন্তু তিনি যে সখীর ন্যায় পঞ্চপতির সহচারিণী ও আজ্ঞানুবর্ত্তিনী ছিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে প্রণয়িনী, প্রিয়সখী ও প্রিয়তমা বলিয়া ভাল বাসিতেন, এই তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ও চরিত্র গৌরব।

কাল সকলেরই নিয়ন্তা। ক্রমে সে ভিক্ষুক রমণী—ভিখারিণী ভারতসিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী। রাজসূয় যজ্ঞের অবভৃথ স্নানে ভারতেশ্বরী দ্রৌপদী ও সমগ্র ভারত নৃপতিগণের উন্নতি ও অবনতির নিয়ন্তা মহারাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত। দুঃশাসন, দুর্য্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি সকলে স্ব স্ব ভারার্পিত কার্য্যে নিয়োজিত। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর অধ্যক্ষ ; শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রী ; এবং কৃষ্ণা সমাগতা রাণী, রমণী ও দরিদ্রা কামিনীগণের অভ্যর্থনা, শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধানে নিযুক্তা। এই রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডবেরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ; কৃষ্ণা—কমনীয়তা, উদারতা ও বদান্যতার প্রতিমা।

মহাক্রতু রাজসূয় যজ্ঞের পর ভারতের সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত পাণ্ডব-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ময়দানব-নির্ম্মিত সুরম্য হর্ম্মে রাজলক্ষীরূপা দ্রৌপদী এখন রাজরাজেশ্বরী এবং প্রজাপালনে স্নেহময়ী মাতার ন্যায়, রাজকার্য্যে মন্ত্রীর ন্যায় এবং স্বামি-সেবায় প্রিয় সখীর ন্যায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সম্পদ বিপদ সুখ দুঃখ পর্য্যায়ক্রমে অবনীমণ্ডলে পরিভ্রমণ করে। পাণ্ডবদিগের সুখের দিন অতিবাহিত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্যূতে আহূত হইয়া দুরোদর মুখে সর্ব্বস্ব হারাইলেন—ধন, সম্পদ, বৈভব, রাজ্য, বল, নিজের ও ভ্রাতৃগণের স্বাধীনতা ও পরিশেষে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন। সভাস্থ সমস্ত ভূপতি রাজাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সুবল-নন্দনের ছলে জয় হইল, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণের আহ্লাদের আর ইয়ত্তা রহিল না। দুর্য্যোধন কহিলেন "ক্ষত্ত! তুমি শীঘ্র পাণ্ডব-প্রাণ-প্রিয়-প্রণয়িনী দ্রৌপদীকে আনয়ন কর। অপুণ্যশীলা কৃষ্ণা এখানে আসিয়া দাসীগণ সমভিব্যবহারে আমাদিগের গৃহ মার্জ্জনা করুক।" এই আজ্ঞা পাইবামাত্র প্রতিকামী দ্রৌপদী সমীপে উপস্থিত হইল। সমাজের নিয়ম এই, পতিই স্ত্রীর একমাত্র গুরু, ও পত্নী স্বামীর সম্পত্তি, স্ত্রী সকল অবস্থায় স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী ; এই নিয়মের বশবর্ত্তিনী হইয়া বাল্মীকি রামের আজ্ঞায় সীতাকে গর্ভাবস্থায় বনে পাঠাইয়াছিলেন, কালিদাসের শকুন্তলা, দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন, সেক্ষপীর কাক্রি-হস্তে দেশদেমোনার জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই পতির আজ্ঞা নির্ব্বিরোধে শিরে ধারণ করিয়া

সরলহৃদয়ে বনবাস কষ্ট, দুঃখভার বহন বা জীবন দান লঘু মনে করিয়াছিলেন।

কিন্তু দ্রৌপদী সে পদবীর রমণী নহেন; তিনি বুদ্ধিমতী, নীতিকুশলা ও কৌশলময়ী—তিনি পরম্পরাগত দৈনন্দিন, সংস্কার স্রোতে গা ভাসাইয়া যান না। প্রতিকামীকে দ্রৌপদী বলিলেন :—"তুমি কেন এরূপ প্রলাপ বলিতেছ; কোনও রাজপুত্র কি পত্নী পণ করিয়া ক্রীড়া করে?" প্রতিকামী বলিল "মহারাজ সমস্ত ধন সম্পদ্ হারাইয়া অগ্রে ভ্রাতৃগণকে তৎপরে আপনাকে দুরোদর মুখে সমর্পণ করিয়াছেন।" দ্রৌপদী কহিলেন—"তুমি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস যে তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যূতমুখে বিসর্জ্জন করিয়াছেন?" দ্রৌপদীর এই প্রশ্নের অভিপ্রায় কি? যখন তিনি শুনিলেন যে তাঁহার স্বামী যিনি তাঁহার জীবন মৃত্যুর কর্ত্তা, যাঁহার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, সেই স্বামী তাঁহার সহিত দ্যূতে পরাজিত হইয়াছেন, তখন তিনি স্বামীর আজ্ঞাবিরোধিনী হইয়া কেন প্রশ্ন করিলেন? ইহার তাৎপর্য্য এই, তিনি মনে বিশ্বাস করেন নাই যে ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মশীলা বুদ্ধিমতী স্ত্রীকে দুরোদর-মুখে সমর্পণ করিবেন। কিন্তু যখন দ্রৌপদী শুনিলেন যে রাজা অগ্রে ভ্রাতৃগণ ও আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন, তখন তিনি বুঝিলেন, যে রাজা দ্যূতে মত্ত হইয়া প্রকৃত অবস্থার বিপর্য্যয়ে কার্য্য করিয়াছেন ও ভ্রাতৃগণ এবং আপনাকে হারাইয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মতঃ ন্যায় ও রাজনীতি অনুসারে দ্রৌপদীকে পণ রাখিতে অসমর্থ, সুতরাং তিনি সভাস্থলে যাইতে বাধ্য নহেন, এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহার সংশয় ছেদন জন্য প্রতিকামীকে যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাইতে বলিলেন—এবং অগ্রে দ্রৌপদীকে, কি আপনাকে দ্যূতে হারাইয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। এ প্রকার যুক্তি—এ প্রকার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দ্রৌপদী ভিন্ন অন্য নারীতে সম্ভবে না। তিনি একটি প্রশ্নে ধর্ম্ম ও ন্যায় উভয় পক্ষ সমর্থন করিলেন এবং আপনার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধি বৃত্তির পরিচয় দিয়া ভারত রমণী সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেন।

(ক্রমশঃ)।

নীরব কুলবধূ।

মুখটি ফুটে কভু কথাটী কহে না,
করিলে লাঞ্ছনা মু'খানা করে ভার,
সজলে আঁখি দুটি ফিরে চাহে না।

ভূমিতে রহে আঁখি, চরণে মাটি আঁকি,
নিশ্বাসে প্রকাশে তার মনোবেদনা—
তবুত মুখ ফুটি কথাটি কহে না।

২

নীরবে সহে শত, পরাণে অবিরত
নিঠুর অভিযোগ কলঙ্ক রটনা,
হৃদয় তাপে গলে, নয়ন ভাসে জলে,
"অহো কি অবিচার—নির্ম্মম তাড়না!"
তবু সে মুখ ফুটি কথাটি কহে না।

৩

চাপান দুখ গুলি, হৃদয়ে উঠে ফুলি,
উচ্ছ্বাসে কহে শত মরম-যাতনা;
হায়রে এমনি করে, বরষ বরষ পরে
কাটিছে দিন, তবু কথাটি কহে না।

অমরাবতী।

(৪২৫-২৬ সংখ্যা ৭৩ পৃষ্ঠার পর)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"মানবজীবন ছাই—বড় বিষাদের"

সুবালা গৃহে ফিরিয়া স্বামী পুত্রের সহিত মিলিত হইল বটে, কিন্তু মনোহরার সেই আকুল আহ্বান ও নিজের ঘোর ভবিষ্যৎ বিপদের কথা যখনই তাহার মনে হইত, তখনই সে অস্থির হইত। কিন্তু মানুষের অবস্থা চিরপরিবর্ত্তনশীল। সুবালার সে অবস্থা বড় বেশী দিন রহিল না। ক্রমে ক্রমে সে সব ভুলিয়া গেল।

সুবালার জীবন এই ভাবে আরও পাঁচ বৎসর কাটিল। ছয় বৎসরের প্রারম্ভে সুবালার বড় পুত্র সুরসেনের মৃত্যু হইল —বড় বধূ উত্তমাদেবী বিধবা হইল।

বিধাতা পুত্রশোকাতুরা সুবালার মুখের দিকে না চাহিয়া তাহার ছোট কন্যা কামিনীকেও অপহরণ করিল। পুত্র কন্যা হারাইয়া মাতৃহীন নাতি নাতনীকে লইয়া সুবালার সুখের জীবন এখন দিবা নিশি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অতিবাহিত হইতে লাগিল। সুখের সংসার দুঃখের অন্ধকারে ঘেরিল। এই আকস্মিক দুঃখে সুবালার স্বামী নক্ষত্র চন্দ্রের সংঘাতিক পীড়া হইল। নক্ষত্র অল্প দিন ভুগিয়াই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সুবালার সংসারের সুখ সাধ মিটিয়া গেল। সুবালা পুত্র কন্যার শোক যাহাকে দেখিয়া সহ্য করিয়াছিল, তাহার অভাব আর সুবালার প্রাণে সহ্য হইল না। অভাগিনী বিধবা হইয়া উন্মাদগ্রস্ত হইল। সুবালা এখন কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো গান করে, কখনো নাচিয়া বেড়ায়। পাগলিনী কখনো বা কনক কিরণময়ী উষাকালে নিভৃত নিকুঞ্জে কখনো বা জ্যোৎস্নাধৌত বকুল মূলে বসিয়া নীরবে কোন এক অজানিত দেশে স্বপ্নরাজ্য রচনা করে। পাগলিনীর হৃদয় কখনো নিরাশায় অন্ধকারে মগ্ন হয়, কখনো বাসন্তি রাগ-রঞ্জিত প্রগাঢ় প্রেমাকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ হয়। সে কখনো

হাস্যময়ী, কখন অশ্রুমুখী—কখন মুখরিত মলয়ানিল-কম্পিত পুষ্পপুঞ্জে সজ্জীকৃত সুরনন্দন বনে খেলা করে, কখনো ঘোরান্ধকার শ্মশান ভূমিতে পড়িয়া হাহাকার করে। একদিনে ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের তলে ভূমিশয্যায় শায়িত হইয়া সুবালা গাহিতেছিল :—

"সইরে না মিটিল পিয়াস হামারি"

সেই সময় মনোহরা আসিয়া সুবালাকে কোলে করিয়া বসিল। উত্তমা শাশুড়ীর নিকটে ছিল, সে মনোহরাকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মনোহরা উত্তমাকে তথা হইতে উঠিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। উত্তমা উঠিয়া স্থানান্তরে গেল। মনোহরা ঔষধ আনিয়াছিল, তখন শীতল জলে গুলিয়া সুবালাকে পান করাইল।

সুবালা মনোহরাকে চিনিল না; কিন্ত সাগ্রহে ঔষধ পান করিল। ঔষধ পান করিয়া বুঝি পাগলিনীর মনে একটু স্ফূর্ত্তি হইল। পাগলিনী মনোহরার সুপবিত্র কোলে শুইয়া উচ্চকণ্ঠে গাহিতে লাগিল—

পতিপদে মতি, রেখো জগৎপতি,
দেখো তাঁরে যেন ভুলি না,
সতী নারী হয়ে, গৌরব লইয়ে,
ভুলি যেন যম-যাতনা।
পতি-পদাম্বুজে, থাক চিত্ত মজে,
পূজি যেন তাঁরে সতত,
স্বামীর চরণ, অমূল্য রতন,
স্বরগ পথের সম্পদ।

সেই বামাকণ্ঠ নিঃসৃত সর্ব্বাঙ্গীণ তানলয়-স্বর পরিশুদ্ধ গান নৈশান্ধকার ভেদ করিয়া চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গাহিতে গাহিতে সুবালার তন্দ্রা আসিল। ক্রমে ক্রমে সেই তন্দ্রা গাঢ় নিদ্রায় পরিণত হইল।

বিধবা হওয়ার পর সুবালার সেই প্রথম নিদ্রা। সুবালা নিদ্রিত হইলে মনোহরা অনেকক্ষণ সুবালার মাথা ও গায়ে হাত বুলাইল। তার পর সুবালার ব্রহ্মরন্ধ্রে একটি ঔষধ লাগাইয়া দিল। তখন আকাশ হইতে বড় বড় ফোঁটায় জল পড়িতেছিল। মনোহরা সুবালাকে ঘরের ভিতর বিছানার উপর শোয়াইয়া দিয়া সে রাত্রির মত চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তাহার পর দিবস প্রভাতে দেবতার মঙ্গল আরতির সঙ্গে সঙ্গে সুবালার কর্ণে একটি মোহন সঙ্গীতের সুর প্রবেশ করিল :—

ঈশ্বরে স্মরণ কর দুঃখ হবে দূর।
হইলে তাঁহার দয়া, ভেঙ্গে যাবে ভব-মায়া,
হৃদয় নরকপুরে হবে সুর-পুর॥
তাঁহার চরণামৃত পান কর মন,
আত্মাতে যে পরমাত্মা,
জ্ঞানশক্তি বুদ্ধি বিদ্যা,
করহে যতন যাতে লভ সেই ধন।
গিরি সরোবর নদী চন্দ্রমা তারা—
যে সৃজিলা অবহেলে,
ফুল ফোটে যাঁর কোলে,
এক লোমকূপে যাঁর কোটি বসুন্ধরা,
তাঁহার চরণে দেহ ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি।
ষড় রিপু বলি দিয়ে, ভক্তিমদে মত্ত হয়ে,

হরি হরি হরি বলি দেহ করতালি,
বিমল আনন্দে আত্মা হবে ভোরপুর।

মনোহরা গাহিতে গাহিতে সুবালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সুবালা মনোহরাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মনোহরা। কাঁদিও না সুবালা! আজ তুমি কেমন আছ?

সুবালা ক্রন্দনের স্বরে কহিল "তোমার ঔষধে আজ আমি অনেক ভাল আছি।"

মনোহরা। সন্তুষ্ট হইলাম। দেখ সুবালা, এ সংসারে যে সুখ নাই, তাহা এখন বুঝিতে পেরেছ?

সুবালার আবার প্রাণ ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইল। সে শুধু কাঁদিতে লাগিল—কথা কহিল না। সুবালার সেই গগনস্পর্শী ক্রন্দনের রোলে মনোহরার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হাহাকার করিয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দ থাকিয়া কহিল "আমিত বুঝিতে পারি না মানুষ কেন আপনার দুঃখ আপনি টানিয়া আনে, আবার তাহার জন্য কান্না কাটি করে।" সুবালা অশ্রু মুছিয়া কহিল "যে কথার অর্থ তুমিই বুঝ না, তাহা আমি কেমন করিয়া বুঝিব?"

মনোহরা। আচ্ছা তাহাই যেন না বুঝিলে; কাঁদিয়া কোনও ফল নাই তাহাত বোঝ?

সুবালা। হাঁ তা বুঝি, কিন্তু বুঝিয়াও ত অবুঝ হই।

মনোহরা। বুঝিয়া কেন অবুঝ হও?

সুবালা। মনোহরা, এ কাঁদাতে যে বড় সুখ। প্রিয়জনের মৃত্যুতে যত শোক দুঃখ, আবার কাঁদিতেও তত শান্তি।

মনোহরা। তা হোক্ তুমি আর কাঁদিতে পারিবে না।

সুবালা কাঁদিয়া কহিল "ভগ্নী! প্রাণের পুত্র কন্যা ও প্রাণাধিককে হারাইয়া আমি সংসারের সকলই হারাইয়াছি। দুঃখিনী বিধবার একমাত্র সম্বল ক্রন্দন, মনোহরা! তুমি যদি আমার সে সম্বল কাড়িয়া লও, তবে আমি কেমন করিয়া বাঁচিব?

মনোহরা সুযোগ পাইয়া কহিল "তাহা আমি তোমাকে শিখাইব। আমার কাছে এমন অমৃত আছে যে তাহা একবার মাত্র পান করিলে মরা মানুষের জন্য আর কান্না পায় না। আর স্বামী পুত্রের দরুণ শোক উপশম হয়।"

কি, কি, কি কহিলে? বলিয়া সুবালা গায়ের জোরে উঠিয়া বসিল। মনোহরার পায়ের উপর পড়িয়া কহিল নিদারুণ শোকানলে অহর্নিশি আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। তোমার কি ইহা উপশম করিবার শক্তি আছে?

সুবালার দশা দেখিয়া মনোহরার অপাঙ্গে এক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে দৃঢ় স্বরে উত্তর দিল, না আমার নিজের কোনও শক্তি নাই; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় সব হইতে পারে।

সুবালা ক্ষণকাল নীরব রহিয়া কহিল আমার একটি কথা মনে হইতেছে সে অনেক দিনের কথা।

মনোহরা। সেই যে তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম সেই কথা বুঝি?

সুবালা। তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলে, বড় সুখে ছিলাম। সেখানে আরো কত ঘটনা হইয়াছিল, তা ভাল মনে পড়িতেছে না।

মনোহরা। ভাল করিয়া মনে করিতে চেষ্টা কর।

সুবালা। হাঁ যেন এখন মনে পড়িতেছে, তুমি আমার ভবিষ্যৎ দেখাইয়ে ছিলে না?

মনোহরা কোন কথা কহিল না।

সুবালা। সেই যে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আহা! সে কথা মনে হইলে প্রাণে এখনো সুখ শান্তি অনুভব হয়। তুমিত শৈশব হইতেই আমাকে সংসার ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলে। হায়! তখন যদি তোমার কথা শুনিতাম, তবে কি আর জীবনে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত! জানি না কত দিনে এই দুঃখময় জীবনের অবসান হইবে। ভগ্নি! প্রথমে তোমার কথা অমান্য করিয়া আমি আপনার কষ্ট আপনি সৃষ্টি করিয়াছি, সে জন্য আমার বড় অনুতাপ হইতেছে।

মনোহরা। ভগবান্ ত সকল সময়েই সহায় আছেন। তুমি ইচ্ছা করিলে এখনো তাঁহার শরণাগত হইতে পার।

সুবালা। তাঁহার চরণে শরণাগত চিরজীবনই আছি। তথাপিও ত দুঃখের হাত এড়াইতে পারিলাম না।

মনোহরা। এরকম দু নৌকায় পা দিয়া শরণাগত হইলে চলিবেনা। যদি তুমি সংসারের সমস্ত দুঃখের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে চাও, তবে সর্ব্বপ্রথমে ইন্দ্রিয় সংযম করিতে হইবে। তারপর ভগবান্‌কে সমস্তই সমর্পণ করিতে হইবে।

সুবালা। মনোহরা, আমি মূর্খ, ক্ষুদ্র, এসব কথার সার মর্ম্ম কিছুই গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

মনোহরা। এখন বুঝিবে না। প্রথমে কিছুদিন সাধু সঙ্গ চাই। তারপর সংযম শিক্ষা করিতে হইবে। তারপর একটু একটু করিয়া ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা দেখা দিবে। তার অনেক দিন পরে ভগবানের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ।

সুবালা। ভগবান্ কি এ পাপীকে দেখা দিবেন?

মনোহরা। ভগবান্ পাপীর বন্ধু।

দারুণ শোকানলে সুবালার হৃদয় জ্বলিতেছিল। সংসার যথার্থই তাহার নিকট বিষবৎ বোধ হইতেছিল। অতএব সে মনোহরার কথায় সমর্থন করিয়া কহিল "সত্যি, মনোহরা, আমার ইচ্ছা হইতেছে এই দণ্ডেই বিষবৎ সংসার ত্যাগ করিয়া তোমার সঙ্গে সত্য পথে ধর্ম্ম রাজ্যে প্রবেশ করি, কিন্তু দেখ—

মনোহরা। আবার কিন্তু দেখ কি? ধর্ম্মের চেয়ে মূল্যবান্ বস্তু এভবে আর কি আছে?

সুবালা। না সে কথা কহিতেছি না। কহিতেছি কি যে এই যে বিধবা পুত্র

বধুটি, এই যে মাতৃহীন শিশু দুটি ইহাদের কি উপায় হইবে? আহা! এরা বড় অনাথা, এই ঘোর বিপদ সময়ে আমি বিনা ইহাদিগকে আর কে দেখিবে? কে স্নেহ করিবে?

মনোহরা। ও সেই কথা, তা সে জন্য ব্যস্ত হইও না। যিনি তোমার হৃদয়ে এ অকৃত্রিম স্নেহ দান করিয়াছেন, তিনিই তাহাদিগকে দেখিবেন ও স্নেহ করিবেন।

সুবালা। আমার ছোট পুত্র সুদেব ও বড় কন্যা মহারমা, তাহারাও ত আমার জন্য কাঁদিবে। আহা! বাছারা পিতৃহীন হইয়া পাগল হইয়াছে। এই সময় যদি আমিও ছাড়িয়া যাই, তবে তাহারা একেবারে সহায়হীন হইবে।

মনোহরা। এই কথাটা তোমাকে কিছুতেই বুঝান গেল না যে মানুষ কোন অবস্থাতেই সহায়হীন হয় না। "সাধু কর্ম্মের ভগবান সহায়।" তুমি, সৎকর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হও, জগৎ সহস্র হস্তে তোমার সাহায্য করিবে। তুমি যদি মায়াবন্ধন ছেদ করিয়া ধর্ম্মপথে যাইতে পার, ভগবান্ তোমার পুত্রকন্যার হৃদয়ে শান্তি বিধান করিবেন।

সুবালা। আমি যাইব—নিশ্চয়ই যাইব। সংসারে শোক দুঃখ নরকাগ্নির ন্যায় মানুষের মনে জ্বলিয়া থাকে। ভগবানের নাম সুধা পান করিতে পারিলে মানুষ সে নরক হইতে উদ্ধার হয়। অতএব আমি যাইব—অদ্যই তোমাদের সঙ্গে যাইব।

মনোহরা। দেখিও মিথ্যা বলিও না। দেখ সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং মিথ্যা অপেক্ষা মহাপাতক আর কিছুই নাই। সত্য—অবিকৃত সত্যই সাধুগণের সনাতন ধর্ম্ম ও পরম গতি।

সুবালা চক্ষু মুদিয়া কহিল "ভগবান্ জানেন আমি মিথ্যা বলিতেছি কিনা।"

মনোহরা "ভগবান্ সহায় হও" বলিয়া সুবালার হাত ধরিয়া উঠিল।

সুবালা মনোহরার সঙ্গে জনমের মত চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সকলে কাঁদিয়া উঠিল। উত্তমা মনোহরার পায়ের উপর আসিয়া পড়িল।

মনোহরা কহিল "তুমি যাইবে?"

উত্তমা। হাঁ যাইব। অমৃত-নিকেতনে যাইব, সেখানে কি আমার হৃদয়-সর্ব্বস্বধন আছেন?

মনোহরা। হাঁ আছেন, প্রত্যেক মানবাত্মা ভগবানের নিকট গিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হয়।

উত্তমা। তবে আমাকে লইয়া চল, এ সংসারে আমার আর কেহই নাই।

ঠিক সেই সময় মাতৃহীন শিশু দুটি উত্তমার অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। উত্তমা তাহাদিগকে কোলে লইয়া চুম্বন করিল।

মনোহরা। এই না বলিলে তোমার কেহই নাই? যদি অমৃত সদনে যাইতে চাও, তবে মায়া বন্ধন ছেদ করিতে হইবে।

সুবালা তখন কাতর হইয়া কহিল

"মনোহরা! এই মাতৃহীন শিশু দুটিকে মানুষ করিবার জন্ত বড় বৌমাকে রাখিয়া যাও। আমার এই শেষ অনুরোধটি রক্ষা কর।

মনোহরা। উত্তম কার্য্যের প্রধান প্রতিবন্ধক মায়া। যাহারা মায়ার ফাঁদে জড়াইয়া পড়ে, তাহারা কখনও অনন্তের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না।

সুবালা। মাপ কর মনোহরা, এই মাতৃহীন শিশু দুটির মুখের দিকে তাকাও।

মনোহরা সেই কান্নাকাটির বিষম গোলের মধ্যে মুহূর্ত্তকালও দাঁড়ান অমঙ্গল-জনক জানিয়া "ভগবান্ সহায় হও, ভগবান্ সহায় হও" বলিতে বলিতে সুবালার হস্ত-ধারণ পূর্ব্বক আপন গুরুদেবের নিকট চলিল।

এই সুবালা পরে ভগবানের প্রণামী লাভ করিয়া জগতের সমস্ত দুঃখ কষ্টের হাত হইতে অব্যাহতি পাইল ও পরম শান্তি লাভ করিল।

শ্রী অম্বুজাসুন্দরী দাস।

ইংলণ্ডের নবরাজা ও ভারতের নবসম্রাটের ঘোষণা পত্র।

নূতন সম্রাট্ স্বর্গগতা মাতার ইচ্ছানুসারে সপ্তম এডওয়ার্ড নাম ধারণ করিয়া ২৩এ জানুয়ারি সিংহাসনাধিরোহণ করেন। সর্ব্ব প্রথম দিনেই ইংলণ্ডবাসীদিগকে সাদর সম্বোধন করিয়া জ্ঞাপন করিয়াছিলেন :—

"যতদিন আমার এই দেহে প্রাণবায়ু সঞ্চালিত হইবে, ততদিনই আমি মনে প্রাণে আমার প্রজাপুঞ্জের শুভ সাধনার্থ ও উন্নতিবর্দ্ধনার্থ ঐকান্তিক যত্ন এবং চেষ্টা করিব।"

ভারতের রাজন্তবর্গ ও সাধারণ প্রজাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন :—

"আমার স্নেহময়ী জননীর স্বর্গারোহণে ইংলণ্ডের অতি পুরাতন ও প্রতিষ্ঠিত রাজ-বংশের উত্তরাধিকারিসূত্রে আমি রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছি এবং এতদ্দ্বারা ভারতীয় রাজ্যসমূহের রাজন্তগণকে ও আমার ভারত সাম্রাজ্যের প্রজাপুঞ্জকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের মঙ্গলসাধন করিতে পারি, ইহাই আমার আন্তরিক অভিলাষ। আমার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সাম্রাজ্ঞী স্বর্গীয়া মাতৃদেবীই সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্ত এবং সেই বিপুল সাম্রাজ্যের শাসন ব্যাপারে তিনি আপনাকে যে অধিকতর ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহারই পরিচয় স্বরূপ "ভারত সাম্রাজ্ঞী" উপাধি ধারণ করেন।

ভারত সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে সকল সময়ে মহারাণী মাতৃদেবী একই রূপ অসীম ও প্রগাঢ় যত্ন দেখাইয়া গিয়াছেন এবং লক্ষ লক্ষ ভারতীয় প্রজাবর্গ তাঁহার প্রতি ও তাঁহার রাজসিংহাসনের প্রতি অকৃত্রিম ও অবিচলিত অনুরাগ ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি তাহা সবিশেষ অবগত আছি।

গত বর্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে দেশীয় রাজন্যবর্গ যে অকৃত্রিম ও উদার সহায়তা প্রদান করিয়াছেন এবং ভারতীয় সৈন্যগণ বিদেশীয় সমরে সংলিপ্ত হইয়া যেরূপ শৌর্য্য ও সাহসিকতা সহকারে যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতেও মহারাণীর এবং তাঁহার রাজসিংহাসনের প্রতি ভারতবাসীর সেই আন্তরিক অনুরাগ ও রাজভক্তি সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইয়াছে।

স্বর্গীয় মাতৃদেবীরই ইচ্ছামতে এবং তাঁহারই অনুমতি লইয়া আমি কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম এবং সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ ভারত সাম্রাজ্যের নগর সমূহ পরিদর্শন করিয়া আমি দেশীয় রাজন্যবর্গ ও দেশের অধিবাসিগণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হইয়া আসিয়াছি। ভারত পরিদর্শন সময়ে আমার হৃদয়ে যে গম্ভীর ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা আমি কখনই বিস্মৃত হইব না, এবং প্রথম ভারত-সাম্রাজ্ঞীর দৃষ্টান্তের অনুসরণে আমি আমার সর্ব্বসাধারণ ভারতীয় প্রজাবর্গের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া সর্ব্বদা স্বকর্ত্তব্য পালনে সচেষ্ট হইব। স্বর্গীয়া জননী স্বকীয় সদ্‌গুণে সমস্ত প্রজাবর্গের প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন, আমি তৎপদাঙ্কেরই অনুসরণে একান্ত যত্ন করিব।”

পরমেশ্বর বর্ত্তমান রাজা ও রাজ্ঞীকে চিরজীবী করিয়া রাজধর্ম্মপালনে সমর্থ করুন, ইঁহাদের উপর ভারতের অসীম আশা ও ভরসা।

বিবিধ তত্ত্ব।

১। আমি একজন, কিন্তু আমার পূর্ব্ব পুরুষ লক্ষ কোটি। এ কথা মিথ্যা কে বলিবে? দেখ আমার একার জন্মের কারণ দুইজন—পিতা ও মাতা। এই পিতা মাতার প্রত্যেকের জন্মের কারণ আবার দুই দুই জন অর্থাৎ ৪ জন। এই ৪ জন ৮ জন এবং সেই ৮ জন ১৬ জন হইতে এবং সেই ১৬ জন ৩২ ও ৩২ জন ৬৪ জন হইতে উৎপন্ন। আমা হইতে ঊর্দ্ধ ৬ পুরুষ মাত্র ধরিলে আমার পূর্ব্ব পুরুষ ১২৮ জন, কিন্তু তাহার ঊর্দ্ধে কত শত পুরুষ চলিয়া গিয়াছে! এই ৬ পুরুষের এবং তাহার ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগের শাখা প্রশাখা আবার কত বিস্তারিত হইয়াছে!

প্রোক্টর নামে এক পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে মানুষের সৃষ্টিকাল যদি ৫০০০ বৎসর ধরা যায় এবং এক এক স্বামী স্ত্রীর বিবাহকাল যদি গড়ে ২১ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলেও একটী দম্পতী হইতে পৃথিবীর লোক সংখ্যা বড় কম হইবে না— ২১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৯৫এর পরে ১৪৪টী শূন্য যোগ করিলে যত অঙ্ক হয়, এক দম্পতী হইতে ততগুলি সন্তান ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। কাহারও মৃত্যু না হইলে এই মানব সন্তানগুলির বাসের জন্য ৩১, ৬৬, ৫২৬র পরে ১২৫টী শূন্য যোগ করিলে যত হয়, আমাদের পৃথিবীর মত ততগুলি পৃথিবী আবশ্যক হইত। কিন্তু হায়! আমার অসংখ্য পূর্ব্বপুরুষ পথিকের ন্যায় ভবপান্থশালায় আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আমিও চলিয়া যাইব!!

২। শুকরের ব্যবসা লাভজনক; শূকরেরা ১৫ বৎসর হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। ইহাদের যেমন অল্প বয়সে সন্তান হয়, তেমনি এক একবারে অনেকগুলি শাবক প্রসূত হয়। শূকর শূকরীর এক বৎসর বয়স হইতে না হইতেই সন্তানোৎপাদনের শক্তি জন্মে। এক যোড়া শূকর পুষিলে এক একবারে ৬টী করিয়া শাবক ধরিলে ১০ বৎসরে ৬৪ লক্ষ, ৩৪ হাজার ৮৩টী শাবক উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহা ন্যূনকল্প। দেখা গিয়াছে একটী শূকরী ২০ বৎসরে ৩৫৫টী শাবক প্রসব করিয়াছে এবং ২০ মাস বয়সে শূকর পিতা ১৪৬৮টী সন্তানের জন্মদাতা হইয়াছে। ইহাতে বুঝিয়া দেখ এক বিঘা জমীতে ধান্য চাষ করিয়া যে লাভ, কয়েক পাল শূকর পালিলে তদপেক্ষা কত অধিক লাভ! এই জন্য প্রবাদ "গেরস্ত কাওরা শোরে কড়ী।" কিন্তু শূকর-পালক কাওরা যে দরিদ্র সেই দরিদ্র!!

৩। পিঞ্জরাবদ্ধা রমণী—আমাদের দেশে এবং অন্যান্য অনেক দেশে স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকেন, তাহাতেই পিঞ্জরাবদ্ধা নাম পাইয়াছেন। কিন্তু এমন দেশ আছে যেখানে সত্য সত্যই স্ত্রীলোকদিগকে পিঞ্জরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। পর্য্যটক ওয়ালেস্ বলেন নিউ ব্রিটেনের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রথা আছে বালিকাদিগের যতদিন বিবাহ না হইবে, ততদিন তাহাদিগকে পিঞ্জরে বাস করিতে হইবে। তাল কাষ্ঠে এই পিঞ্জর সকল প্রস্তুত হয় এবং বালিকার বয়স দুই তিন বৎসর হইলে তন্মধ্যে তাহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। পিঞ্জর গৃহমধ্যেই তৈয়ার করা হয় এবং বাড়ীর চারিদিক্ শরের বেড়ায় আবৃত। বালিকারা কোনও কারণে বাটীর বাহির হইতে পারে না এবং তাহাদের বাসস্থানে বায়ু সঞ্চালনের তাদৃশ সুবিধা নাই, তথাপি তাহারা বেশ সবল ও সুস্থকায় হইয়া থাকে।

৪। মানুষের বয়স ১০০ বৎসর হইলেই যথেষ্ট মনে করা হয়। প্রাচীন বৈদিক কালেও শতায়ু পুত্র পৌত্রের জন্য দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করা হইত। কিন্তু ১০০ বর্ষের অধিকও মানুষ বাঁচে।

আমাদের দেশের শতাধিক বর্ষের পুরুষ রমণীর মৃত্যু সংবাদ গৌরবের সহিত সময় সময় সংবাদ পত্রে প্রচারিত হয়। নিম্নে বিদেশীয় কতকগুলি বিশেষ পরীক্ষিত বয়সের তালিকা প্রদত্ত হইতেছে, তন্মধ্যে লুইসা টস্কো নাম্নী এক স্ত্রীলোক ১৭৫ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, আর সকলে ১৩০ বা তদধিক। ১৮৮৭ সালে মেক্সিকোর জেমস্ নামে এক নিগ্রো অনেকগুলি ডাক্তারের সমক্ষে নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ করে যে তাহার বয়স ১৩৫ বৎসর।

মৃত্যু বৎসর	নাম	বয়স
১৭৫৯	ডন কামারন	১৩০
১৭৬৭	ঐ টেলার	১৩০
১৭৮০	উইলিয়াম ইলিস	১৩১
১৭৭২	বিবি কিথ	১৩৩
১৭৭৭	জন ক্রুক	১৩৪
১৭১৪	জেন হারিসন	১৩৫
১৭৭১	মারগারেট ফষ্টার	১৩৬
১৭৭২	জে রিচার্ডসন	১৩৭
১৭৭২	বিবি ক্রুম	১৩৮
১৭৭২	কাউণ্টেস ডেসমণ্ড	১৪০
১৭৭৮	সোয়ার্লিং (কাথলিক সন্ন্যাসী)	১৪২
১৭৭৩	চার্লস এমক্লিনলি	১৪৩
১৭৫৭	জন এফিং হ্যাম	১৪৩
১৭৮২	ইভান উইলিয়ামস্	১৪৫
১৭৬৬	টমাস উইন্সলো	১৪৬
১৭৫২	উইলিয়াম মিড	১৪৮
১৬৪৮	টমাস ডাম	১৫৯
১৭৬৮	ফ্রান্সিস কফি	১৫০
১৭৪২	টমাস নিউম্যান	১৫২
১৭৯৭	জোসেফ সরিংটন	১৬০
১৬৬৮	উইলিয়াম এডওয়ার্ডস	১৬৮
১৬৭০	হেনরি জেঙ্কিন্স	১৬৯
১৭৮০	লুইসা টস্কো	১৭৫

উল্লিখিত ব্যক্তিদিগের সকলেই ব্রিটীষ দ্বীপবাসী। আমেরিকায় দীর্ঘায়ু দিগের মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৮৮	প্রাণী রোস (সেণ্ট কেরোলিণা)	১৩১
১৮৭৮	ইউগেলিয়া পেরেজ (কালফার্ণিয়া)	১৪০

৪। মানবের আয়ু ক্রমে হ্রাস হইতেছে, আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিদিগের সংস্কার ইহার বিপরীত। তাঁহারা বলেন অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই মানুষের পরমায়ু সিকি পরিমাণ বাড়িয়াছে। জর্জিয়ার ডাক্তার টডের মতে জুলিয়াস সিজারের সময় রোমবাসীদিগের বয়স গড়ে ১৮ বৎসর ছিল, এখন ৪০ বৎসর। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসীদের বয়স গড়ে ২৮ বৎসর ছিল, এখন ৪৫র অধিক। জেনিভায় ১৩ শতাব্দীতে মানবের জীবনলীলা ১৪ বৎসরে ফুরাইত, এখন ৪০ বর্ষে। রাজ্ঞী এলিজেবেথের সময় ইংলণ্ডবাসীদের বয়স গড়ে ২০ বৎসর ছিল, এখন লণ্ডনেই ৪৭ বৎসর। আমাদের অধঃপতনের কারণ কি আমাদের স্বাস্থ্যহানিকর বর্ত্তমান কুপ্রথা সকল নয়? স্বাস্থ্যের সুনিয়ম এবং নীতি ও ধর্ম্মের সুব্যবস্থা সকল যে

জাতি যত পালন করেন, সে জাতি তত সুস্থ, সবল, জ্ঞানী, ধার্ম্মিক ও সুখী হয়। অদৃষ্টবাদী বা ধর্ম্মবিহীন স্বেচ্ছাচার-রত জাতির অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

গীতাসার ব্যাখ্যা।

(গত বারের পর)।

২। দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

যিনি দুঃখসকলে উদ্বিগ্নমনা হন না এবং সুখ সকলে স্পৃহাশূন্য, অনুরাগ, ভয় এবং ক্রোধবিহীন এ প্রকার ব্যক্তিকে স্থিতধী মুনি বলা যায়।

বৃক্ষে যেমন জীবন আছে, তাহার বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, শরীরধারী জীব-মাত্রও সেইরূপ নিয়মের অধীন এবং সুখ-দুঃখের হস্তে খেলনাস্বরূপ। আমদের মন কতকগুলি প্রবৃত্তির আয়তন—ধন-স্পৃহা, মানস্পৃহা, ভোগস্পৃহা ইত্যাদি। এই প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ হইলে মনে সুখ হয়, আর তাহা না হইলে দুঃখের উৎপত্তি হয়। সুখ দুঃখের কারণ বাহিরে, কিন্তু তাহার অনুভব অন্তরে। পণ্ডিতেরা ত্রিবিধ দুঃখ ও সুখের উল্লেখ করিয়াছেন, আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। ভৌতিক কারণে অর্থাৎ জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা যে সুখ দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহা আধি-ভৌতিক। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলপানে যেমন সুখ হয়, অতিবর্ষা তাড়নে তেমনি দুঃখ। সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবনে যেমন সুখ, ঝঞ্ঝাবাতে তেমনি ক্লেশ। আধিদৈবিক—জীব জন্তু হইতে যে সুখ দুঃখের উদয় হয়। গৃহ পালিত পশু পক্ষী প্রভৃতি হইতেও এই সুখ দুঃখ হয়। আধ্যাত্মিক সুখ দুঃখ যাহা নিজের শরীর বা মনঃসম্ভূত। যেমন স্বাস্থ্যে সুখ, অস্বাস্থ্যে দুঃখ, আশা ও উৎসাহে সুখ, নিরাশা ও অবসাদে দুঃখ; জ্ঞান অজ্ঞানতা, প্রেম অপ্রেম, পুণ্য ও পাপ হইতেও যে সুখ দুঃখের উদ্ভব হয়, তাহা আরও গভীর আধ্যাত্মিক। স্বভাবের নিয়মে এই সকল দুঃখ জীব মাত্রেই অবশ্য ঘটিয়া থাকে এবং তাহা দ্বারা চিত্ত সর্ব্বক্ষণ আন্দোলিত ও বিচলিত হয়। কিন্তু যিনি স্থিতধী, তিনি এই সর্ব্বপ্রকার সুখদুঃখ দ্বন্দের অতীত। তিনি সদা শান্ত ও সন্তুষ্ট চিত্ত—কোনও প্রকার আধিভৌতিক, আধিদৈবিক বা আধ্যাত্মিক দুঃখে তাঁহার মনের উদ্বেগ বা বিক্ষোভ জন্মে না।

"শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ,
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্।

জগতে শোকের কারণ সহস্র সহস্র এবং ভয়ের কারণ শত শত বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে মূঢ় ব্যক্তিদিগকেই অভিভূত করে, পণ্ডিতদিগকে করিতে পারে না। অজ্ঞান লোক বালকের ন্যায়

আপনার প্রবৃত্তির বেগে চলিতে যায়, বাধা পাইলেই অধীর ও ক্ষুভিত হয়। তত্ত্বজ্ঞানী ধীর ব্যক্তি দুঃখের প্রকৃত কারণ জানিয়া ধৈর্য্যশীল ও স্থিরচিত্ত হন। তিনি আত্ম-সংযমপরায়ণ দৃঢ়চিত্ত, বাহ্য কারণে তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না।

স্থিতধী মুনি যেমন দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না, তেমনি সুখেও তাঁহার লোভ নাই। সাধারণ জীবগণ দুঃখ হইতে নিবৃত্তি চায় এবং সুখের জন্য লালায়িত। পূর্ব্বে যে সকল কামনার উল্লেখ করা গিয়াছে তাহা শরীরের ক্ষুধা তৃষ্ণার ন্যায় মনের স্বাভাবিক ভাব, তাহার হাত সহজে এড়াইতে পারা যায় না, তবে জ্ঞানী ব্যক্তি সুখের অনিত্যতা জানিয়া তাহার স্পৃহা পরিত্যাগ করেন। সাংসারিক সুখ মাত্রেরই তিনটী লক্ষণ দেখা যায়, তাহা অনিত্য, অসার ও মলিন। (১) "সম্পদ তড়িৎ সমান উন্মীলি নিমীলয়ে।" সুখ বিদ্যুতের মত মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। (২) ইহাতে মনকে নীচ করে, স্বার্থপর ক্ষুদ্রচেতা করিয়া দেয়, এই জন্য ইহা মলিন। আর (৩) ইহার গভীরতা অতি অল্প। সুখ অনেক সময় ছায়ার মত কল্পনায় থাকে, তাহার সারত্ব বা বস্তুত্ব ধরিয়া ছুঁইয়া পাওয়া যায় না। জ্ঞানী ব্যক্তি এরূপ সুখের কেন কামনা করিবেন?

আর যাঁহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে তিনি বিষয়ানুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত। যাঁর বিষয়ে বাসনা নাই, তাঁর তাহাতে আসক্তি হইতে পারে না—তাঁহার ক্ষতি ও লাভ, জীবন ও মৃত্যু উভয়ই সমান। ঈশ্বরেচ্ছায় ধন হইল, ভাল; গেল, সেও ভাল;—সন্তান হইল ভাল, মরিল, সেও ভাল। তিনি সংসারে থাকিলেও সংসারের কোনও বন্ধনে বদ্ধ নন এবং মৃত্যুর জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত। তিনি সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে ভয়শূন্য। তিনি সমদর্শী; জগতের সকল বস্তু ও সকল ঘটনাকে সমান চক্ষে দেখেন। তাঁহার শত্রু মিত্র নাই। মঙ্গলময়ের জগতের সকলের মধ্যেই তিনি মঙ্গল ভাব দেখেন—হিংস্র ব্যাঘ্র ভল্লুকও তাঁহার মনে ভয়ের উদ্রেক করিতে পারে না, কেন না তাহাদের মধ্যেও মঙ্গলময়। যিনি আপন আত্মাতে পরমাত্মাকে লইয়া সর্ব্বদা সুখী এবং বহির্জগতে তাঁহারই প্রেমলীলা দেখেন, তাঁহার মনে সন্তোষ সর্ব্বদা বিরাজমান, কাহারও প্রীতি অপ্রীতি বা হিংসা বৃদ্ধি হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহাতে ক্রোধের সম্ভাবনা কি? যেখানে স্নিগ্ধ জলের সমুদ্র, সেখানে যেমন আগুন নাই, সেইরূপ প্রশান্ত চিত্ত স্থিতধী মুনির হৃদয় প্রশান্ত ও সম্পূর্ণ ক্রোধ-বিবর্জিত। তাঁহার অমৃতবর্ষী চক্ষু যাহার উপর পড়ে, তাহাকে শীতল করে, এরূপ ব্যক্তিকে উত্তপ্ত করিবে কে?

"তাহাঁকি দুঃখ বল সংসারে,
যে জন সত্যকে আশ্রয় করে।
করে কালযাপন, হয়ে হৃষ্ট মন
দেখে ব্রহ্মরূপ অন্তরে বাহিরে।"

আমার কেহ নাই!!!

সরোজিনী—অধোবদনে একান্তে বসিয়া আছেন, নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া ধরাতল সিক্ত করিতেছে। তিনি নীরবে বসিয়া কি ভাবিতেছেন, কেন কাঁদিতেছেন, তাহা কেহ জানিতেছে না। তাঁহার মনে একই চিন্তা, সে চিন্তা—"আমার কেহই নাই।" সেই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়কে উচ্ছলিত করিয়া শোক-প্রবাহ বহাইতেছে। এমন সময় তাঁহার প্রতিবেশিনী এবং বাল্যসখী বিন্ধ্যবাসিনী তথায় আসিয়া উপস্থিত। বিন্ধ্যবাসিনীর সহিত তাঁহার যে কেবল বাহ্য প্রণয় ছিল এমত নহে, উভয়েই উভয়কে অকৃত্রিম ভাবে ভালবাসিতেন, সুতরাং একের সুখে অপরের আন্তরিক সুখ এবং একের দুঃখে অপরের আন্তরিক দুঃখ হইত। বিন্ধ্যবাসিনী গৃহে প্রবেশ করিয়া সরোজিনীর পার্শ্বে বসিয়াছেন, কিন্তু সরোজিনী এত দূর চিন্তামগ্না যে গৃহে কে আসিল, কে তথা হইতে চলিয়া গেল, সে দিকে লক্ষ্য নাই; তাই তিনি বিন্ধ্যবাসিনীর গৃহ প্রবেশ অনুভব করিতে পারেন নাই। বিন্ধ্যবাসিনী ও বন্ধুর অশান্তি উৎপাদনের ভয়ে কিয়ৎকাল কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না; কিন্তু যখন দেখিতে পাইলেন কিছুতেই সরোজিনীর চৈতন্য জন্মিতেছে না, তখন নিরুপায় হইয়া বলিলেন "ভাই সরোজ? আজ একলাটি বসে এত কাঁদ্‌ছ কেন? ভাল শ্যাম বাবু কি তোমায় কিছু বলেছেন? তিনি ত তোমায় খুব ভাল বাসেন, তিনি ত তোমায় কাঁদাবার লোক নহেন?

সরোজিনী—না তা কিছুই হয় নাই, তবে কিনা "এ সংসারে আমার কেহই নাই।" এই ভেবে ভেবে চোখের জল পড়্‌ছিল।

বিন্ধ্য—সে কি কথা! তোমার ত সংসারে সকলই আছে—মা বাবা ভাই বোন শ্বশুর শাশুড়ী সবাই আছেন। তার উপরে স্বামী—শ্যাম বাবু ত সোণার মানুষ। রূপে গুণে তার মত আর একটি পুরুষ ত দেখা যায় না! তবে তোমার শোক কিসের?

বিন্ধ্যবাসিনীর দৃষ্টি একটু স্থূল, তাই সরোজিনীর কথার সার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন না, ইহা অনুভব করিয়া সরোজিনী বলিলেন "হাঁ ভাই সংসারের দিক্ দিয়া দেখ্‌তে গেলে আমার সবাই আছে। কিন্তু আমি সে কথা বল্‌ছি না। আমার ভাল মন্দ যদি কেহ না দেখে বা দেখায়, তা হলে এসব থেকেইবা ফল কি?

বিন্ধ্য—কেহ তোমার ভাল মন্দ দেখে না, এ মিথ্যা কথা। শ্যাম বাবুও দেখেন না? তিনি ত কিসে তোমার সুখ হবে, তার জন্য পাগল। ভাল ভাল গহনা,

ভাল ভাল কাপড় যা তোমার ঘরে আছে, একজন রাজরাণীরও সেরূপ নাই। এর চেয়ে আর বেশী কি চাও? এজন্য সকল লোক তোমার স্বামীকে "স্ত্রৈণ" ব'লে উপহাস করে।

সরোজিনী—তুমি নিজে যা ভাল মনে কর, অপরেও তাই ভাল মনে করে, এই তোমার বিশ্বাস। ভাল খাওয়াইলে, কি দুখানি গয়না কিংবা দামী এক খানি সাড়ী দিলেই কি আমার ভাল দেখা হল? আমারত তা মনে হয় না।

বিন্ধ্য—তবে আর কি কল্লে হয়?

সরোজিনী—সে কথা কি আবার তোমায় বুঝিয়ে বল্‌তে হবে? দেখ বহু দিন থেকে আমি পরনিন্দা কর্ত্তে ভাল বাসতেম। যখনই একটু সুযোগ পেতেম, তখনই কার না কার নিন্দা কর্ত্তে বসতেম। আমার স্বামীর নিকট বসে কত সময় কত লোকের কোষ্ঠী কেটেছি, কই এক দিনের তরেও আমায় সাবধান করেন নাই, বরং তাতে যোগদান করে আমায় উৎসাহিত করেছেন। এই কি আমার ভাল চাওয়া? তিনি আমার ভাল খুঁজে বেড়ালে তৎক্ষণাৎ আমার দোষ দেখিয়ে দিতেন! তা না দিয়া যখন আরও আমায় উৎসাহিত করেছেন, তখন বুঝেছি এ জগতে আমার ভাল খোঁজে এমত কেউ নাই। কেবল কি পরনিন্দা? কত পাপ আমার মধ্যে রয়েছে, কই স্বামী ত এক দিনের তরেও আমার পাপের কথা আমায় বলেন নাই। তিনি দেখছেন আমার শরীর, আমার আত্মার দিকে ত একবার চান না, তবে কি করে তাঁকে আমি "আমার দরদী" বল্‌তে পারি?

বিন্ধ্য—তা হলে তাঁকে আর আগো শরীরে থাক্‌তে হত না, তুমি যে বকে বকে ভূত ভাগিয়ে দিতে। দোষের কথা এ সংসারে কজন লোক শুনতে ভালবাসে?

সরোজিনী—তুমি কি আমায় তাই মনে করেছ? তুমি কি কখনও আমার দোষ ধরে দিতে গিয়ে নাকাল হয়েছ? যিনি দোষ দেখ্‌য়ে দিয়ে থাকেন, তিনি ত আমার পরম বন্ধু।

বিন্ধ্য—বেশ বুঝলেম ভাল "এ সংসারে কেউ নাই।" তবে "পরনিন্দা করে তুমি যে পাপ করছিলে" এ কথাটা কে বলে দিল?

সরোজিনী—ভাই! কোনও লোক বলে নাই। আমার মনে হঠাৎ উহা আপনিই উদয় হয়েছে।

বিন্ধ্য—তাও কি হয়? তুমি যে কাজ ভাল মনে করে কর্ত্তেছিলে, আপনা থেকে কি আর তা মন্দ মনে হয়? হয় কোন শাস্ত্র পড়ে তোমার সে জ্ঞান হয়েছে, না হয় কোন লোক মুখে শুনে হয়েছে।

সরোজিনী—না, আমি সত্যি করে বল্‌ছি আমার এ রূপ কিছু হয় নাই। তবে কি না ভিতর হ'তে কে যেন এক দিন বলে দিলেন "সরোজিনী! ও কি করছ? পরনিন্দা করে ফল কি? ও যে মহা পাপ! আপনার দোষের অন্ত নাই, পরনিন্দা করে বেড়াও।

বিদ্যা—তোমার ভিতর থেকে যিনি বলে দিলেন, তিনি যে কেউ হউন না কেন, তিনিই ত তোমার আপনার জন, কারণ তিনি তোমার দোষ ধরিয়ে দিলেন। তবে "তোমার কেউ নাই" তুমি এ কথা বলছ কি করে?

বিদ্যাবাসিনীর কথা শুনিয়া সরোজিনী চিন্তা করিতে লাগিল। "যিনি অন্তরে থাকিয়া আমার দোষ দেখাইতেছেন, তিনিইত আমার আপনার পরম হিতকারী বন্ধু। তবে আমার কেউ নাই, এ কথা বলি কি করে? তজ্জন্য শোকই বা করি কেন? আমি এরূপ উপকারী বন্ধুকে চিনিতে পারিতেছি না কেন? তিনি যে আমার ঈশ্বর, তিনিই যে আমার গুরু। তিনিই আমার পাপ প্রদর্শন করিয়া আমাকে নরক যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিতেছেন। সংসারের আত্মীয় স্বজন যাহা করিতে পরাঙ্মুখ—এমন কি জীবনের সুখ দুঃখভাগী স্বামীও যাহা করিতে পারেন না, তিনি তাহা করিয়া আমাকে চির-শান্তি সুখ সম্ভোগের অধিকারিণী করিতেছেন। আমি আর কখনও এরূপ হিতকারী বন্ধুকে পরিত্যাগ করিব না, সর্ব্বদা তাঁহার অমিয় বাণী শুনিবার জন্য কর্ণ পাতিয়া রাখিব। তিনি যখন যে দোষ প্রদর্শন করিবেন, প্রাণপণে তাহার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে চেষ্টা করিব।"

সরোজিনী মনে মনে এই সংকল্প করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন "ভাই বিদ্যা! আজ তুমি আমার প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিলে। বহুদিন থেকে আমি যে মানসিক অশান্তিতে কাল কাটাচ্ছিলেম, আজ সে অশান্তি দূর হইল। আমি যে ভাব্‌তেছিলাম যে আমার কেউ নাই, সেইটা আমার ভ্রান্তি। আমার এমন একজন আছেন, যিনি সর্ব্বদা আমার মঙ্গল খুঁজে বেড়ান। আমি তাঁকেই আপনার বলে ধরবো। তাঁর অভয় কোলে মাথা রেখে সংসার পথে চলতে পারে আমার আর ভয় থাকিবে না।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারি।

বিজ্ঞান রহস্য।

টিলটোমেটন।

ফনোগ্রাফ, কেন্টোগ্রাফ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ প্রভৃতি উদ্ভাবিত হইয়া বিজ্ঞান জগতের কত উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে! তাড়িত শক্তিই এই সকল উদ্ভাবনার মূল। বামাবোধিনীর পাঠকগণ ইতিপূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক টেস্‌লার বিদ্যাবত্তার ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা শুনিয়াছেন। ইনি একজন আমেরিকাবাসী ইতালীয়। ইহাঁর নাম নাইকোলাস্ টেস্‌লা। ইনি বহুদিন অবধি তাড়িত শক্তির অনুসন্ধানে

প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে শক্তি প্রভাবে সূক্ষ্ম আকাশে বিনা তারে বার্ত্তা প্রেরিত হইতে পারে, তদ্দ্বারা এমত প্রভূত শক্তি সঞ্চালিত করা যাইতে পারে, যাহাতে অসম্ভব কার্য্য সকলও সম্ভাবিত হইবে। নায়েগারা জল-প্রপাতের কথা সকলেই জানেন। এই প্রপাতের বেগ এত অধিক যে তদ্দ্বারা শত শত শিল্প কল নিয়ত সঞ্চালিত হইতেছে। এই বেগের আনুমানিক বল পঞ্চাশৎ সহস্র অশ্বের সমবেত শক্তি। টেসলার এই প্রভূত শক্তি অবলীলাক্রমে সঞ্চালন করিয়া থাকেন। তিনি কার্য্যতঃ বিদ্যুজ্জাত এই অসীম শক্তির মধ্যে স্বীয় শরীর নিক্ষেপ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে তাহার বেগ দুর্ব্বহনীয় নহে। তিনি অনায়াসে বায়ুরাশির মধ্য দিয়া এই শক্তি প্রবাহিত করিয়া দূর দূরান্তরে প্রেরণ করিতে পারেন। তিনি প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন যে পলকের মধ্যে এই প্রভূত শক্তি সূক্ষ্মাকাশের মধ্য দিয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রতাড়িত হইতে পারিবে। পাষাণময় বন্ধুর ভূমি ও বালুকাময় উষর জমিও এই শক্তি প্রভাবে সম্যক্ কর্ষিত ও উর্ব্বর হইয়া ফল শস্য উৎপাদন করিবে। এই শক্তির সাহায্যে মানব পৃথিবীর যে কোন স্থানে সুখে বাস করিতে সমর্থ হইবে এবং বিনা ক্লেশে বা স্বল্প আয়াসে ভূমি কর্ষণ বা আবাদ করিতে পারিবে। উর্ব্বর ক্ষেত্রে চাষ ও মরুভূমিতে উদ্যান নির্ম্মিত হইবে এবং সমস্ত পৃথিবী ফল শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া মানবের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবে। আপাততঃ ইহা স্বপ্নকল্প বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু বিজ্ঞান প্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে এবং হইয়াছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। বিজ্ঞানবিদ্ টেস্লা সম্প্রতি একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার নাম টিলটো-মেটন (Telautometon)। ইহার গঠন এক খানি নৌকার মত। ইহাতে দাঁড়ী বা মাজী কিছুই নাই, কেবল তাড়িত শক্তি প্রবাহে প্রচালিত হইয়া থাকে এবং এই তাড়িত শক্তিও বিনাতারে যে কোন স্থান হইতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা দূরত্ব বা নৈকট্যের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। তিনি বলেন এই যন্ত্রের উন্নতি প্রভাবে কালে পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না; কারণ তখন রণক্ষেত্রে সেনা ও যোদ্ধৃগণের আবশ্যক হইবে না—একমাত্র কলের দ্বারাই যুদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইবে, সুতরাং অনর্থক সৈন্য রক্ষার ও চালনার ব্যয়-ব্যসন ও প্রাণহিংসা হইবে না। তখন মানব যুদ্ধবিদ্যায় বিরত হইয়া শান্তি শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইবে, পৃথিবীময় শান্তি রাজ্য বিস্তারিত হইবে। যদিও ইহা বহুকাল-সাপেক্ষ, তথাপি ইহার কল্পনাও সুখাবহ, তাহার সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানের উন্নতিতে জগতের উন্নতি, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত সত্য।

ধ্যান।

(সাবিত্রী)।

কৃত্বা কালজয়ং মৃতং স্বদয়িতং
সঞ্জীবয়িত্বা পুনঃ
ধৃত্বা বক্ষসি ঘোরদুর্গমবনা—
ন্ত্রাত্রৌ ব্রজন্তীং গৃহম্।
অক্ষং ভূতিবিলেপনং চ দধতীং
বাসঃ কষায়ারুণং
সাবিত্রীং স্মর ভাস্বরাং ত্রিভুবনে
সাধ্বীশিরোভূষণম্ ॥

যমদণ্ড চুর্ণ করি বক্ষেতে পতিরে ধরি
নিশীথে ভীষণ বন হতেছেন পার ;
গৈরিক বসন অঙ্গে কুঠার করণ্ড সঙ্গে
সূর্য্য হেন দেহ-প্রভা হরিছে আঁধার।
আলু থালু কেশপাশ, হৃদয়ে নাহিক ত্রাস
অক্ষমালা, অক্ষবালা, বিভূতি ভূষণ ;
পবিত্রতা তেজোরাশি যেন একাধারে আসি
মিশিয়াছে জীবলোক নিস্তার কারণ।
সতীত্ব-প্রভাবে যাঁর ধন্য পুণ্য এ সংসার
ঘুষিছে যাঁহার কীর্ত্তি সুরাসুর নরে ;
অতুলনা এ রমণী সতীকুল-শিরোমণি
স্মরহ সাবিত্রী দেবী বিমল অন্তরে।

(সীতা—অশোক বনে)

ধ্যায়ন্তীং মীলিতাক্ষীং রঘুমণিমনিশং
মস্তকন্যস্তহস্তা—
মস্রৈরাপ্লাব্যমানাং বিমলিনবসনাং
রোদনোচ্ছূননেত্রাম্।
তেজঃসংস্তম্ভিতাভিঃ সচকিতনয়নং
বীক্ষিতাং রাক্ষসীভি—
র্ভাসাং বহ্নেঃ সধূমামিব কৃশমলিনাং
ধ্যায় সীতামশোকে ॥

হস্তেতে মস্তক রাখি, মুদিয়া কমল-আঁখি
রামের চরণ সদা করিছেন ধ্যান ;
কেঁদে কেঁদে দিবারাত্র ফুলিয়াছে দুটী নেত্র
অশ্রুজলে ভাসে গাত্র, নাহি বাহ্যজ্ঞান।
দুরন্ত রাক্ষসীগণ লয়ে নানা প্রহরণ
তাড়ন করিতে তাঁরে রয়েছে ঘেরিয়া;
কিন্তু সতী-কলেবরে কি সাধ্য আঘাত করে
তেজে স্তব্ধ হয়ে আছে সভয়ে চাহিয়া।
মলিন বসন গায় ধূলায় ধূসর কায়
অগ্নিশিখা ঢাকা যেন ধূম-আবরণে ;
পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরূপা ভগবতী
ধ্যান কর সীতা সতী অশোক কাননে।

(সীতা—অগ্নিমধ্যে)

জ্বালামালাবলীঢ়াঽরুণকমলদল-
চ্ছন্নদেহেব লক্ষ্মীঃ
মূর্ত্তা দেবীব বহ্নের্জিতদহনমহ-
স্তেজসা প্রজ্বলন্তী।
ক্রোড়ে মাতুঃ স্থিতেবাঽমলমুখকমলাঽম্লান-
বস্ত্রাঙ্গরাগা
ধ্যেয়া সীতাঽগ্নিমধ্যে সুরকরনিপতৎ-
পুষ্পবর্ষাবকীর্ণা ॥

শত-অগ্নি-শিখা-মাঝে বিরাজেন সতী,
রক্ত-শতদল-বনে কমলা যেমতি ;
অনল শীতল ভাবে ছুঁইছে চরণ,
অগ্নির দেবতা বুঝি এ নারীরতন !
অগ্নি-মধ্যে কিছুমাত্র গ্লানি নাই মুখে,
জননীর কোলে যেন বসেছেন সুখে ;
অঙ্গরাগ, বসন, ভূষণ সমুদয়
অগ্নিতাপে অণুমাত্র ম্লান নাহি হয় ;

জ্বলিছে সতীর তেজ জিনি হুতাশন,
হেরিয়া অমরে করে পুষ্প বরিষণ।
কর ধ্যান জানকীর শ্রীপদ-কমল;
জুড়াবে শোকের জ্বালা, হইবে শীতল।

(গীতা—পাতালে)

দীর্ণক্ষৌণীসমুদ্যদ্‌ভুজগপতিফণা—
রত্নসিংহাসনস্থাং
পাতালান্তর্বিশন্তীং প্রণিহিতনয়নাং
প্রাঞ্জলিং ভর্তৃপাদে।
দৃষ্টাং লোকৈঃ সবাষ্পৈঃ সকরুণরুদিতং
মূর্চ্ছিতা চৈব সীতা
পাতিব্রত্যপ্রদীপ্তাং স্মর ধরণিসুতাং
তাপসীপুণ্যবেশাম্‌॥

উঠিল ফণীন্দ্র-শীর্ষ ভেদিয়া ধরণী,
তদুপরি রত্নাসনে শ্রীরাম-রমণী;
করযোড়ে এক দৃষ্টে পতিপানে চান,
পতি-পদে মিশিয়াছে আত্মা মন প্রাণ;
রঘুকুল লক্ষ্মী ওই রসাতলে যায়!
হাহাকার করি' রাম পড়িছে ধরায়;
অশ্রুনেত্রে লোকবৃন্দ দেখিতে দেখিতে,
সীতা-মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল অবনীতে;
পবিত্র তাপসী-বেশ, অতুল মহিমা,
সতীত্ব ধর্ম্মের যেন জ্বলন্ত প্রতিমা;—
এ মূর্ত্তি হৃদয়-পটে সদা যার রয়,
অশোক বৈকুণ্ঠ লোক সে লভে নিশ্চয়।

বিদায় সঙ্গীত।

আজ কি আনন্দের দিন!
আশীর্ব্বাদ কর, ভাই!
বিদেশের কাজ সেরে বিদায় লয়ে দেশে
যাই। ১
ব্যাকুল হয়েছে মন, হেরিবারে পরিজন,
পিতার চরণ আর কতদিন দেখি নাই! ২
এ হেন শুভ সময়ে কেহ গো কাতর হয়ে,
দিও না হৃদয়ে ব্যথা, ভাল বাসার
দোহাই! ৩

আছি শত অপরাধী, মিনতি করিয়া সাধি
ক্ষমা কর, মনে রেখ, সুখে থাকহ
সবাই। ৪
প্রবাসের প্রলোভন, বাঁধিয়া শরীর, মন,
কত যে দেগেছে হৃদে, কেমনে দাগ
লুকাই। ৫
তাই বড় ভয় মানি, ভাগ্যে কি আছে না জানি
পিতার চরণ তলে, স্থান পাই কি
নাপাই। ৬

নূতন সংবাদ।

১। আগামী ৩রা মে চৈত্র-পূর্ণিমা মঙ্গলবার বুদ্ধ দেবের ২৪৪৫ বার্ষিক পরিনির্ব্বাণোৎসব হইবে।

২। মেটকাফ হল লর্ড কুর্জনের সহায়তায় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নামে আখ্যাত হইয়াছে এবং ম্যাকফার্লেন সাহেব তাহার পুস্তকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। বোম্বাইয়ে আবার দুর্ভিক্ষের

সূচনা হইয়াছে। রাজপ্রতিনিধির অনুমান এই দুর্ভিক্ষ প্রশমনার্থ ১ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে।

৪। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম স্বর্গীয় মোক্ষমূলারের গুণবতী পত্নী তাঁহার জীবন-চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

৫। মহারাণী বিক্টোরিয়ার শবদেহ তাঁহার নিজের ইচ্ছানুসারে বৈবাহিক পরিচ্ছদে ও তাঁহার স্বামি-প্রদত্ত অঙ্গুরীতে ভূষিত হইয়া স্বামীর সমাধি-পার্শ্বে সমাহিত হইয়াছে। সতী স্বামীর সহিত অনন্ত স্বর্গসুখ ভোগ করুন্।

৬। মহারাণী ৮০টীর অধিক কোম্পানীর নিকট জীবন বিমা করেন, তাঁহার মৃত্যুতে তাহাদিগকে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছে।

৭। ১৯০১ সালের ১লা মার্চ্চ লোক সংখ্যা গণনায় ভারতে সর্ব্বশুদ্ধ ২৯, ৪২, ৬৬, ৭০১ লোক হইয়াছে, তন্মধ্যে পুরুষ প্রায় ১৫ কোটি, স্ত্রীলোক ১৪॥০ কোটিরও কম। ১৮৯১ অপেক্ষা প্রায় ২ কোটি লোক বাড়িয়াছে।

৮। বিবী এজ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' হইয়াছেন, ইহাতে আর একটী স্ত্রী-ফেলো আছেন।

৯। ১৬ই মার্চ্চ যুবরাজ ডিউক অব ইয়র্ক সস্ত্রীক অষ্ট্রেলিয়া যাত্রা করিয়াছেন।

১০। লেডী কুর্জন দুইটী কন্যাসহ স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন।

বামা-রচনা।

সাধুতার জয়।

দেবতার পায় সঁপি আপনায়
মহা সাধু হরিদাস
করে নাম গান, প্রেমরস পান,
তরুতলে অধিবাস।
নাহি কোন ভার ভাবনা তাঁহার,
যেখানে বাসনা যায়,
বসিয়া বিজনে আপনার মনে
সুখে বিভুনাম গায়।
কভু গিরিশিরে, তটিনীর তীরে,
গহনে, পুষ্পিত বনে,
নাচে, গায়, হাসে, আঁখিনীরে ভাসে,
ভাবের ফোয়ারা মনে!
কত শত জন করেছে পীড়ন,
করেছে প্রহার কত,
ছাড়েনা যে নাম, প্রাণের আরাম,
না হয় পাপেতে রত।
থাকে অনাহারে বরিষার ধারে,
দারুণ আতপে, হায়!
তবু মুখে হাসি, প্রাণে সুধারাশি,
বিভুনাম রসনায়।

যে কেহ তাঁহার করে অপকার,
বলে তারে হরিদাস,—
"চিরসুখে থাক, তাঁরে ভাই ডাক,
হইবে দুর্গতি নাশ।"
কাছে যেবা যায় তাঁহারে ভজায়
মধুমাখা নাম বলে,
হরষিত চিত হয় বিগলিত,
ভাসে নয়নের জলে।
কখনো বিজনে বসি যোগাসনে
তাঁহারে ধেয়ান করে;
হৃদয় মাঝারে সে রূপ নেহারে,
ঝর ঝর আঁখি ঝরে!

(২)

আজ মধুমাসে মধু যামিনীতে
সোণার কমল আকাশে ভাসে!
সরসী-সলিলে বিকচ কুমুদ
নীরবে চাহিয়া নীরবে হাসে!
গাছে গাছে ফুল শোভিছে কতই
মলয় সমীর সুধীর বয়!
বহে সুরধুনী, সুধা-প্রবাহিণী,
মৃদু কল কলে, রজতময়!
কৌমুদীবসন পরিয়া রজনী
সরল সোহাগে কতই হাসে!
আহা কি মধুর সে কোমল হাসি,
প্রেমের প্রবাহে জগৎ ভাসে!
যোগে সমাহিত সাধু হরিদাস
শিশির-নিষিক্ত শরীরখানি!
উধাও মানস কোথা গেছে তার
কোন্ শান্তিধামে, নাহিক জানি!
এ মহাসাধনে বিঘ্ন সাধিবারে
পতিতা রমণী অদূরে থাকি,
করিতেছে কত বিফল প্রয়াস
"উঠ,উঠ যোগী" বলিয়া ডাকি!"

(৩)

ত্রিযামা বিগতপ্রায়, চন্দ্র অস্তাচলে যায়,
শুক তারা উদিল গগনে;
পরিয়া কুসুম ভূষা ধূসর-বসনা উষা
হেসে হেসে আসিল ভুবনে।
বহিল প্রভাতী বায়, বিহগ কাকলি গায়,
ধ্যানে সাধু তখনো মগন,
প্রশান্ত বয়ানে তাঁর পড়িল আলোক ধার,
অরুণের তরুণ কিরণ।
নিশীথিনী পোহাইল তথাপি যে না হইল
সাধুর সে ধ্যান সমাপন,—
নিকটে বসিয়া নারী আকুল হইল ভারী
কুবাসনা ভাবিয়া আপন।
সহসা নয়নে তার ঘূর্ণমান এ সংসার,
রমণী হইল অতি ভীত,
হৃদয়ে কি বাজিল যে নয়নে কি লাগিল যে,
কি করে হৃদয় বিদলিত!
মরমে দংশিল তার, শত অহি অনিবার,
অভাগী না পারিল সহিতে,
পাপের বিষম জ্বালা কাঁদিতে কাঁদিতে বালা
সাধুপদে লাগিল কহিতে,—
"সহেনা সহেনা তাপ, পলে পলে শত পাপ
করিতেছি আমি অভাগিনী,
যোগী তুমি হা কি কব ভাঙ্গিতে সাধনা তব
আসিয়াছি নিরয়-গামিনী!
পাপের যাতনা ঘোর সহেনা সহেনা মোর,
কি উপায় হইবে এখন?
বল বল সদাশয়, কিসে মোর গতি হয়,
আর জ্বালা না যায় সহন!"

আর্দ্র হয়ে করুণায় হরিদাস কহে তায়,
"নাহি ভয়, বল হরি হরি,
পাপ তাপ দূরে যাবে, চির শান্তি সুখ পাবে
বিষ্ণুনাম বল প্রাণ ভরি।"

তখন দুজনে তাঁরা হরিনামে মাতোয়ারা,
নাচে আর বলে হরিবোল,
নিরখি, সে দেশবাসী নয়ন সলিলে ভাসি
মাধুরে আসিয়া দিল কোল!

শ্রীসুভাষিণী দেবী।

শুধাইছ কেন ভাবি?

শয়নে, স্বপনে, রাখিতাম যারে
হৃদয় আড়ালে ঢাকি;
খুলিলে কপাট দেখিতাম যার
স্নেহভরা দুটী আঁখি;
শূন্য এ হৃদয়, কোথা গেল সে যে,
আঁধার শুধুই দেখি;
(তবু) শুধাইছ কেন ভাবি?
ছিনু তো একেলা, ছিল না জঞ্জাল,
কেন তারে দিলে ডাকি?
কেন বা ধরিলে মানস মুকুরে,
মায়াময় তার ছবি;
দেখাইয়া লোভ এবে কেড়ে নিলে
মেঘেতে ঢাকিলে রবি,
(তবু) শুধাইছ কেন ভাবি?

অক্ষত রাখিয়া বৃক্ষ ভূমিপরে,
কাটিতেছ তার মূল,
জান না কি তরু শুখাবে অচিরে
কেন তবে এত ভুল?
অযাচিত মোরে দিয়াছিলে যাহা
নিতেছ তাহা ত সবি,
(তবু) শুধাইছ কেন ভাবি?
গগনে তপন সলিলে নলিনী
করে শুধু তাকাতাকি;
এত দূরে থেকে ভুলিতে কি পারে
আপনার প্রাণ-সখী?
হৃদয় আগুনে পুড়িয়া সে মরে
দূর আকাশেও থাকি।
(তবু) শুধাইছ কেন ভাবি?

শ্রীমতী সুরবালা দেবী।

বিক্টোরিয়া পারিতোষিক রচনা।

নিম্নলিখিত ৫টী বিষয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রত্যেক রচনার জন্য বামাবোধিনী বিক্টোরিয়া স্মৃতিফণ্ড হইতে ১০ টাকা পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। লেখিকাদিগকে আগামী আষাঢ় মাসের মধ্যে বিশ্বস্ত প্রমাণসহ স্ব স্ব রচনা বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে:—

১। মহারাণী বিক্টোরিয়ার জীবন হইতে কি কি শিক্ষা লাভ করা যায়?
২। মহারাণী রমণীকুলের আদর ও গৌরব।
৩। আদর্শ রাজ্ঞীদিগের মধ্যে মহারাণীর স্থান কোথায়?
৪। মহারাণীর নর-জীবন ও অমর জীবন।
৫। রমণীর সাম্রাজ্য প্রেমের রাজ্য।

১৩০৭ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

৪। ইতিহাস, জীবনচরিত ও দেশভ্রমণ।

মহারাণী বিক্‌টোরিয়ার অন্তিম শয্যার প্রতিকৃতি।